দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

অনুপ্রবেশ রোখাই
অসমে নতুন
সরকারের
সবচেয়ে বড়ো
চ্যালেঞ্জ
— পৃষ্ঠা : ১৫

হিন্দুদের কি
বাংলাদেশ
ছাড়তে হবে?
— পৃষ্ঠা : ৯

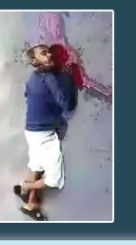

৬৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ২৭ জুন ২০১৬।। ১২ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

অসমকে অনুপ্রবেশ-মুক্ত করাই বড় চ্যালেঞ্জ সর্বানন্দ সোনোয়ালের

- ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী অসমে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ।
- অসমের ২৩ জেলার মধ্যে ৬টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ।
- সীমান্ত সংলগ্ন অসমের চারটি জেলার প্রতি বর্গকিমির জনঘনত্বের গড় ৭৭৭ (জাতীয় গড় ৩৮৩)।
- বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী ২০৪৭ সালের মধ্যে অসম হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হবে।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১২ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৭ জুন - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

হিন্দুদের কি বাংলাদেশ ছাড়তে হবে? ▯ ৯

খোলা চিঠি : চোপ! তদন্ত চলছে, কোনো কথা নয় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

অসম জয়ের তাৎপর্য ▯ সুবীর ভৌমিক ▯ ১২

অসমে নতুন উদ্যম, নতুন প্রত্যাশা ▯ বাসুদেব পাল ▯ ১৩

অনুপ্রবেশ রোখাই অসমে নতুন সরকারের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৫

জাতীয় ও আঞ্চলিক সত্তার সমন্বয়ে যে জয় তা ধরে রাখার উপরেই সর্বানন্দ সরকারের সাফল্য নির্ভর করছে ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৭

কুম্ভমেলায় ভারতদর্শন ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ২১

জ্ঞানতাপস মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

অনন্তনাগ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ভূস্বর্গে একপ্রকার গণভোট ▯ দিলীপ পড়গাঁওকর ▯ ২৭

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে দু-এক কথা ▯ প্রিয়ব্রত মুখোপধ্যায় ▯ ২৯

রোগ নিরাময়ে যোগ ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৩১

গো-হত্যার অর্থ মাতৃহত্যা ▯ কমল মুখোপাধ্যায় ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭**▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৪ জুলাই, '১৬

প্রকাশিত হবে
৪ জুলাই, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সাংস্কৃতিক জাতীয়তা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয়তাবোধের ধারণা বহু প্রাচীন। এখানে জাতীয়তাবোধ সংস্কৃতি-ভিত্তিক। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তার ধারক। এই বিষয় নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ। লিখেছেন অমলেশ মিশ্র, চিত্তরঞ্জন পাত্র প্রমুখ।

দাম একই থাকছে - ১০্ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

নারদ ঘুষ কাণ্ডে তদন্ত

নারদ স্টিং কাণ্ডটির সিবিআই তদন্ত দাবি করিয়া একটি জনস্বার্থ মামলা কলকাতা উচ্চ আদালতে প্রধান বিচারপতির এজলাসে বিচারাধীন। ভিডিও ফুটেজটি (যেখানে তৃণমূল মন্ত্রী ও কর্মীরা ঘুষ লইতেছেন দেখা যাইতেছে) আসল না নকল তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হইয়াছে। খুব শীঘ্রই এই রিপোর্ট জানা যাইবে। লোকসভার এথিক্স কমিটিও স্টিং-এর ঘটনাটি লইয়া বিচার-বিবেচনা করিতেছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে—স্টিং-এর ঘটনাটি কি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীরা বাস্তবিকই টাকাগুলি লইয়াছিলেন? রাজ্য সরকার এই কাণ্ডের সত্যতা যাচাই করিতে কয়েকদিন আগে তদন্তভার কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজীব কুমার সেই পুলিশ কর্তা, সারদা কাণ্ডে যিনি তদন্ত করিবার পর সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়াছিল। তবুও মুখ্যমন্ত্রী এই পুলিশ কমিশনারকেই তদন্তের দায়িত্ব দিয়াছেন এবং দলীয় কর্মশালায় মন্তব্য করিয়াছেন ফিরহাদ হাকিম বা শুভেন্দু অধিকারী কি খাইতে পান না যে টাকা লইতে যাইবেন। আসলে তাঁহার দলের নেতাদের ফাঁসানো হইয়াছে বলিয়া তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের তদন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হইবে না। উল্টে নারদ নিউজ এজেন্সির বিরুদ্ধে হইবে। ইহার পর পরই রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় পুলিশে যে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন তাহার প্রতিপাদ্যও একই। ঘটনা হইল তিনি এমন এক মন্ত্রীর স্ত্রী, যাঁহার স্বামী নিজেই ওই ঘুষ কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর এই তদন্তের নির্দেশে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীপক্ষ সোচ্চার হইয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য, যদি এই ঘুষ কাণ্ড লইয়া মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিলেন তবে তাহা প্রথমেই করিলেন না কেন? দ্বিতীয়ত, যাঁহারা এই কাণ্ডে অভিযুক্ত তাঁহাদের দ্বিতীয়বার মন্ত্রী করিলেন কেন? ইহার ফলে তদন্ত পক্ষপাতদুষ্ট হইবে না এমন গ্যারান্টি কোথায়? সারদা কাণ্ডের তদন্তের ভার এই পুলিশ কমিশনারেরই ছিল। তিনি সারদা কাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছিল। এমনকী নির্বাচন কমিশনও কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদ হইতে তাঁহাকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। অথচ দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হইয়া তিনি সেই রাজীব কুমারকেই কলকাতা পুলিশ কমিশনার হিসাবে পুনর্বার নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিরোধী পক্ষের অভিযোগ, রাজীব কুমার এমনই একজন পদাধিকারী যিনি মুখ্যমন্ত্রীর ইশারায় চলিয়া থাকেন। তাই তাঁহার কাছ হইতে কতটা নিরপেক্ষতা আশা করা যায় তাহা সন্দেহের বিষয়। এই তদন্ত যে 'আই ওয়াশ' বা ধোকা দেওয়া মাত্র, ইহা বুঝিতে বিশেষ বুদ্ধির দরকার হয় না। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও রাজ্য সরকারের পৃথক তদন্তকে বিশেষ আমল দেননি।

রত্নাদেবীর অভিযোগও পরিকল্পনা মতোই করা হইয়াছে। কেননা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত শুরু করিতে হইলে পুলিশকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা করিতে হইত। এই ক্ষেত্রে রত্নাদেবীর অভিযোগ পুলিশকে তদন্ত করিতে সাহায্য করিবে। ইহাতে একটা বিষয় স্পষ্ট—যাঁহারা অভিযুক্ত, তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের আড়াল করিতে তদন্ত করিতেছেন। যাঁহার বিরুদ্ধে এই তদন্ত, নারদ নিউজ পোর্টালের সেই কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলের প্রতিক্রিয়া—প্রতিহিংসার মনোভাব থেকেই এইসব করা হইতেছে যাহাতে তাহাকে জেলে পোরা যায়। যাহাই হউক, এই তদন্ত নিষ্পক্ষ হওয়া দরকার, কেননা উচ্চ আদালত ও লোকসভার এথিক্স কমিটিতেও ইহা বিচারাধীন।

সুভাষিতম্

যুগান্তে প্রচলেন্মেরুঃ কল্পান্তে সপ্তসাগরাঃ।
সাধবঃ প্রতিপন্নার্থং ন চলতি কদাচন।। (চাণ্যকনীতি)

পর্বত যুগান্তে কম্পিত হতে পারে, সাত সমুদ্র কল্পান্তে উদ্বেলিত হতে পারে। কিন্তু সাধুপুরুষগণ যা প্রতিজ্ঞা করেন, তার থেকে কখনোই বিচলিত হন না।

আন্তর্জাতিক যোগদিবসে কলকাতার রাজপথ যোগপথে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতার রাজপথে এ এক বিরল দৃশ্য। পূব আকাশে সূর্যদেব তখন সামান্য এগিয়েছেন। রাণী রাসমণি রোডে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সমবেত ভাবে সূর্য নমস্কারের আগে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন--- আদিতস্য নমস্কারান...। এরপরই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগ অভ্যাস করছেন মঞ্চের উপর কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং, আর এস এসের সহসরকার্যবাহ ভাগাইয়াজী পর্যন্ত। অন্যান্যদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন যোগদিবস উদযাপন সমিতির সভাপতি মেঃ জে. এস এন মুখার্জী (অব) এবং ক্রীড়াভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখার সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ উপস্থিত দর্শকদের একাংশও যোগাভ্যাসে অংশ নেন।

গত ২১ জুন ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। ঘড়ির কাঁটা ধরে অত্যন্ত অনুশাসনের সঙ্গে ১০টি যোগাসন ও ৩টি সূর্য নমস্কার ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শন করে। বক্তারা সকলেই সুস্থ শরীর ও মনের জন্য যোগাসনের উপযোগিতা ও সারা বিশ্বে তার স্বীকৃতির কথা তুলে ধরে বলেন, এর সঙ্গে কোনো বিশেষ ধর্মীয় উপাসনার যোগ নেই। বসুধৈব কুটম্বকম্— এই একাত্মতার ভাব সারা বিশ্বে যোগের মাধ্যমে ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। মিছিল বিক্ষোভ অবরোধে ক্লান্ত কলকাতার রাজপথ যে কিছুক্ষণের জন্যও যোগপথ হয়ে উঠল এদিনের এটাই একটা বড় পাওনা।

কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।

আন্তর্জাতিক যোগদিবসে চণ্ডীগড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উল্লেখ্য, ভারতের সব রাজ্যে তো বটেই প্রত্যেক জেলা কেন্দ্রেও পালিত হয় যোগদিবস। পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে ৩০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে যোগদিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের প্রায় ১৭০টি দেশে যোগদিবস পালন করা হয়।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু মুসলমানদের জন্য নয় : ড. কৃষ্ণগোপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র সংখ্যালঘু মুসলমানদের পঠন-পাঠনের কেন্দ্র বলে যে সিদ্ধান্ত ইউপিএ সরকার গ্রহণ করেছিল তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে 'সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়'— এই তকমার আড়ালে সরকারের তপশিলি জাতি, জনজাতি সংক্রান্ত সংরক্ষণ নীতি উপেক্ষা করে চলেছে। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির সংখ্যালঘু 'স্টেটাস' সম্পর্কে পূর্বতন ইউপিএ আর বর্তমান এনডিএ সরকারের নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান সরকারের নীতির ভিত্তি হলো ১৯৬৮ সালের অ্যাপেক্স কোর্টের আদেশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু স্টেটাস সম্পর্কিত একটি মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ইউপিএ সরকার শীর্ষ

ড. কৃষ্ণগোপাল

আদালতে যে আবেদন করেছিল, বর্তমান এনডিএ সরকার গত এপ্রিল মাসেই তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

ড. কৃষ্ণগোপাল বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধুমাত্র মুসলমান পড়ুয়াদের জন্য কিনা সে ব্যাপারে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, এম সি চাগলা এবং নুরুল হাসান যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমরা তাকে সমর্থন করি। তিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধীও ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলেন। আমরা নতুন কিছুই বলছি না। ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সংখ্যালঘু তকমা দিতে চেয়েছিল। আমরা আবার এ ব্যাপারে ১৯৬৮ সালের শীর্ষ আদালতের রায় বলবৎ করতে চাইছি।'

জাতীয় সংরক্ষণ নীতি এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষক একটি আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. কৃষ্ণগোপাল বলেন, 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে। কিন্তু বেনারস সরকারি সংরক্ষণ নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খ মানলেও আলিগড় মানে না। এই নীতির সঠিক রূপায়ণ হলে লাখ লাখ তপশিলি জাতি, জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এটা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' ২০০৫ সালে তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং প্রথম আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সংখ্যালঘুদের বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ঘোষণা করেন। কৃষ্ণগোপাল সেই সিদ্ধান্তকে ভুল বলে ব্যাখ্যা করেন।

সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গ : বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে জামাতের সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্য যাতে সন্ত্রাসবাদীদের আত্মগোপন করার নিরাপদ শেল্টারে না পরিণত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে দল।

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত রাজ্য কর্মসমিতির বৈঠকে সন্ত্রাস ঠেকাতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে বলা হয়েছে, 'আমাদের দাবি পশ্চিমবঙ্গকে সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার যে খেলা চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। সেই সঙ্গে বন্ধ হোক ভোটের জন্য তোষণের রাজনীতি।' খবরে প্রকাশ, ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির সুযোগে জামাতের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই ঝাড়খণ্ডে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। উদ্বেগ বাড়ছে সর্বস্তরে।

বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খাগড়াগড়, কালিয়াচকের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও এ রাজ্যের সরকার তা থেকে শিক্ষা নেয়নি। বিজেপি যে এই ধরনের দেশবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করবে না সে কথাও জানানো হয়েছে দলের তরফ থেকে।

এদিকে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে একের পর এক হিন্দু হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা সরকারের কড়া সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীকে সন্ত্রাসবাদীরা খুনের হুমকি দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগে ছিলেন। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশনকে দেওয়া হুমকির ব্যাপারে জোরদার ব্যবস্থা নিয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজও আমাদের ব্যবস্থায় পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

কইরানায় ঘরছাড়া হিন্দুদের ৩৮টি গ্রামের তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কইরানা নিয়ে দেশজোড়া বিতর্কের মধ্যেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ৮টি জেলার ৩৮টি গ্রামের তালিকা প্রকাশ করল যেখানে বহু হিন্দু পরিবার সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সংগঠনের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন গত ২৯ জুন বলেন, উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি জেলাতেই 'প্রচুর কইরানা' ঘটে চলেছে। পরিষদ জেলায় জেলায় এনিয়ে নিপীড়িত হিন্দুদের উপর সমীক্ষা চালাবে। ভি এইচ পি-র দাবি মতো এখানে দশ বছরে হিন্দু জনসংখ্যা ৪০-৫০ শতাংশ থেকে কমে ৮-১০ শতাংশে নেমে এসেছে। শামলির সাংসদ হুকুম সিং-ই প্রথম কাইরানা এবং কান্ধলার হিন্দু পলায়নের ঘটনা প্রকাশ্যে আনার পর বহু তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। মিডিয়ায় প্রকাশিত হিন্দু নিপীড়িত ৩৮টি গ্রামের মধ্যে মিরাট, শামলি, বিজনৌর, আমরোহা, সাহারানপুর, মোরদাবাদ, রামপুর, সান্তলাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রাম ছাড়াও প্রদেশের ৩২টি শহরেও হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত।

উবাচ

"তিস্তা নিয়ে তিন পক্ষের মতামত এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঐক্যমত্য তৈরি হওয়াটা জরুরি। তিনটি পক্ষ হলো— বাংলাদেশ, ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার।"

সুষমা স্বরাজ,
কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

বিধানসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ফের কথা শুরুর প্রসঙ্গে।

"দেশের কয়েকজন প্রতিভাধর খেলোয়াড় রিও অলিম্পিকে যোগ দিতে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বিষয় সুনিশ্চিত করছি।"

জিতেন্দ্র সিং
কেন্দ্রীয় ক্রীড়মন্ত্রী

"সংসদে যখন জিএসটি বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, সিপিএম তখন কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু কেরল সরকারের এখন এই বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই।"

পিনারাই বিজয়ন
মুখ্যমন্ত্রী, কেরল

জিএসটি বিল পাস প্রসঙ্গে।

"শিক্ষাতে গৈরিকীকরণ এবং দেশেও গৈরিকীকরণ হবে। যা দেশের জন্য কল্যাণকর তাই-ই হবে। সেটা গৈরিকীকরণ বা সঙ্ঘের আদর্শ যাই হোক না কেন।"

রামশঙ্কর কাথেরিয়া
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী
মানবসম্পদ উন্নয়ন

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছত্রপতি শিবাজীর ৩৪২তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস' উৎসবে।

"ইজরায়েলকে দেখুন ওরা কীভাবে চিহ্নিতকরণের কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধর্মের ভিত্তিতে দেগে দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'"

ডোনাল্ড ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট
পদপ্রার্থী

অরল্যান্ডোর নাইট ক্লাবে আই এস বন্দুকবাজের তাণ্ডব প্রসঙ্গে।

হিন্দুদের কি বাংলাদেশ ছাড়তে হবে?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ হিন্দু সম্প্রদায়কে কি বাংলাদেশ ছাড়তে হবে? সাম্প্রতিক সময়ে এই শঙ্কার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন হিন্দুরা। একের পর এক হামলা, সাধু-সন্ন্যাসী-সেবায়েত হত্যা, শিক্ষক নিগ্রহ, মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙচুর, জায়গাজমি দখল এবং বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ— এই শঙ্কার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়ন নতুন কিছু নয়। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হওয়ার পর থেকে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা নতুন রূপ নেয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ব্রহ্মচারী ও সাধু-সেবায়েত হত্যা, ধর্মীয় গুরুদের প্রাণনাশের হুমকি, ইসলাম অবমাননার

হিন্দুহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল।

ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে শিক্ষক নিগ্রহ এবং তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা এক ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিকে অনেকে একাত্তরের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করছেন। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সাধু-সন্ন্যাসী ও বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সেবায়েতরা। স্কুল-কলেজের হিন্দু শিক্ষকরা আতঙ্কে আছেন কখন ক্লাসে পড়ানোর সময় ইসলাম ও হজরত মোহম্মদকে অবমাননা করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদের মারধোর ও চাকুরিচ্যুত করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে হিন্দুদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল, তারা মনে করছেন, এই হামলা-হত্যার মাধ্যমে হিন্দুদের দেশ ছাড়ার বার্তাই দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চগড়ে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে হত্যার মধ্য দিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর হামলা ও হত্যার সাম্প্রতিক পর্ব শুরু হয়। একে একে নিহত হন পঞ্চগড়ে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় ব্রহ্মচারী, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সাধু পরমানন্দ, গাইবান্ধায় দেবেশ প্রামাণিক ও স্বপন ভট্টাচার্য, ঝিনাইদহে পূজারি ব্রাহ্মণ আনন্দ গাঙ্গুলি, পাবনায় শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর সৎসঙ্গ আশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে। হত্যা করা হয়েছে নাটোরে খৃষ্টান ধর্মযাজক সুনীল রোজারিওকে। হিসেব অনেক বড়, এটা মাত্র কিছু সময়ের। এই প্রতিবেদন তৈরি করার সময় খবর পাওয়া গেল, মাদারীপুরে একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীকে বাড়িতে ঢুকে চাপাতি দিয়ে (বড় ছুরি) কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে জঙ্গিরা। তিনি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহারাজকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ধর্ম প্রচারে কোথাও না যাওয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় এ বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের ওপর তিন গুণ বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানি, জায়গাজমি দখল ও বাড়িঘর-মন্দিরে হামলা হয়েছে গত বছরের চেয়ে ছয় গুণ বেশি। প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে এ বছরের প্রথম তিন মাসের বিবরণে বলা হয়েছে, এই কালপর্বে ১০ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিহত হয়েছেন। হামলায় আহত ৩৬৬ জন। দুই হিন্দু মেয়েকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। আটজন ধর্ষণের শিকার হয়েছে, তার মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে চারজন। জমিজমা দখল, বাড়িঘর, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে ৬৫৫টি।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক নির্বাচন। বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা। সাম্প্রতিক তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তা আবারো প্রমাণিত হলো। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ প্রার্থীদেরই রমরমা। কিন্তু যারা আওয়ামি লিগের মনোনয়ন পাননি সেই সব আওয়ামি লিগ নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন মূল আওয়ামি লিগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। আওয়ামি লিগ প্রার্থী জিতলে বিদ্রোহী প্রার্থী সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা করেছেন। বিদ্রোহী প্রার্থী জিতলে আওয়ামি লিগ প্রার্থীরা হামলা করেছেন হিন্দুদের ওপর। সারাদেশেই এই চিত্র। হিন্দু পাড়া আক্রান্ত, বাড়িঘরে আগুন, নারীধর্ষণ এবং নির্বিচারে লুট পাট। সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, দিনাজপুর, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুরে হামলার পর দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুদের মধ্যে। এক প্রতিবেদনে বলা

হয়েছে, হামলার পর বেশ কিছু হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে। যশোরের পাশাপোল থেকে ৩০টি পরিবার ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দুশিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে দেশ ছাড়া করার নতুন ষড়যন্ত্র। সম্প্রতি বাগেরহাটে দুই হিন্দু শিক্ষককে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ এনে মারধোর করা হয়। স্থানীয় সাংসদ তাঁকে কান ধরে ওঠবস করান। ওই সময় পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেই শিক্ষক শেষ পর্যন্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে স্কুল-কলেজে হিন্দু শিক্ষকদের একটা অবস্থান রয়েছে, তাদের বিতাড়িত করতেই এই ষড়যন্ত্র। ইসলামি দলগুলো দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছে, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। তাদের অভিযোগ, হিন্দু শিক্ষকরা ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমে অন্যতম বাধা। গত কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম ও নবীকে অবমাননার অভিযোগ এনে অন্তত চব্বিশজন হিন্দু শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। হামলা করা হয়েছে বাড়িঘরে। এর পেছনে আরও একটি কারণ আছে বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দু শিক্ষকদের সরিয়ে সেখানে মুসলমান শিক্ষকদের নিয়োগ করা। এ ব্যাপারে স্থানীয় সাংসদ ও আওয়ামি লিগ নেতারা প্রধান ভূমিকা নিচ্ছেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রধান সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতারা মনে করেন, সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সারাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। তাদের মনে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আস্থাহীনতার জন্ম দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জে প্রধান শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে কয়েকদিন আগে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে ঐক্য পরিষদ নেতারা শ্যামল কান্তি ভক্তের লাঞ্ছনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কান ধরে ওঠবস করেন। একই সঙ্গে এদেশে সংখ্যালঘু হিসেবে জন্ম নেবার অপরাধে জাতির কাছে ক্ষমাও চাওয়া হয়।

করদাতাদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলুন : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বছরের শেষে আয়কর জমা দেবার সময় অনেকেরই মুখ বাংলার পাঁচ-এর মতো হয়ে ওঠে। কেউ কেউ নানা ফন্দিফিকির বের করে আয়কর কম দেন অথবা দেনই না। প্রতিবছর সরকারের রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি বেড়ে যায়। সম্প্রতি আয়কর বিভাগ আয়োজিত রাজস্ব জ্ঞান সঙ্গম অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রোগের নিদান দিয়েছেন। তাঁর মতে, করদাতাদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে বুঝতে হবে কোথায় তাদের অসুবিধে। এ কাজ করতে হবে আয়কর বিভাগের আধিকারিকদের। দেশের প্রয়োজনের কথা বুঝলে আর কেউ কর ফাঁকি দেবেন না। প্রধানমন্ত্রীর সহাস্য মন্তব্য, 'কেউ যদি গুগলকে প্রশ্ন করে ভারতে কীভাবে কর দিতে হয় তাহলে সাত লক্ষ রেজাল্ট পাওয়া যাবে। আর যদি কর না দেবার উপায় সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয় তাহলে বারো লক্ষ রেজাল্ট পাওয়া যাবে।' সুতরাং তাঁর পরামর্শ মানুষের আরও কাছে যেতে হবে। সহজ করতে হবে কাজের পদ্ধতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের ২৫ কোটি পরিবারের মধ্যে ১৫ কোটি কৃষিজীবী পরিবার। চলতি অর্থবর্ষে সরকার তাদের আয়করের আওতায় আনতে চায়।

এছাড়া আগামী অর্থবর্ষে নতুন ১০ কোটি করদাতা আয়করের আওতাভুক্ত হবেন। সেইজন্যেই প্রধানমন্ত্রী আয়কর আধিকারিকদের শিক্ষক এবং পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতে বলছেন। যাতে করদাতা আর সরকারের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না থাকে।

ভারত জাপান আমেরিকার যৌথ নৌ-মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বহুদিন ধরেই চীন ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। সঙ্গে দোসর জুটিয়েছিল পাকিস্তান, তুরস্কের মতো কয়েকটি ইসলামিক দেশকে। কতকটা চীনকে ঠাণ্ডা করতেই ভারত মহাসাগরের মালাবার উপকূলে ভারত, জাপান এবং আমেরিকা শুরু করল যৌথ নৌ-মহড়া। মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'মালাবার ২০১৬'। চীনও অবশ্য চ্যালেঞ্জ জানাতে দেরি করেনি। তবে সরাসরি নয়, নজরদারির ঢঙে। মার্কিন বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস স্টেনিসের পিছনে সর্বক্ষণ একটু দূরত্ব রেখে ঘুরছে একটি চীনা যুদ্ধ জাহাজ। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা চীনের স্পর্ধা দেখানোর কৌশল। চীন বোঝাতে চাইছে তারা ভীত নয়। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা ভারত, জাপান, আমেরিকার মধ্যে তৈরি হওয়া এই নতুন অক্ষকে ঘিরে চীন যথেষ্ট চাপে আছে। সেই জন্যই চীন সম্প্রতি নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে (এন এস জি) ভারতের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে। অন্যদিকে, আমেরিকার কাছ থেকে আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল (ইউএভি) কিনতে চলেছে ভারত। যার সংক্ষিপ্ত নাম প্রিডেটর-সি। ৬৫০০ পাউন্ডের পরমাণুবোমা বহনক্ষম এই ঘাতক ড্রোন মাটি থেকে পঞ্চাশ হাজার ফুট উচ্চতায় একটানা ১৮০০ মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে। এই ড্রোন হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

চোপ! তদন্ত চলছে, কোনো কথা নয়...

মাননীয় ম্যাথু স্যামুয়েল
এডিটর, নারদ টিভি
সম্পাদক মশাই,

খুব তো ক্যামেরাম্যান সেজে ছবিটবি তুললেন। অনেক হাততালিও কুড়োলেন। কিন্তু দিদির কিছু করতে পারলেন! পারেননি। এবার দিদির খেলা শুরু। সবাই হাততালি দেবে। আপনি ঠেলা সামলান।

এই রাজ্যের ব্যাপারটা তো জানেন না, জানলে অমন মাতব্বরি করতেন না। খুব ছবি তুলে ভেবেছিলেন ধোয়া তুলসী পাতা নেতাগুলোর গায়ে কালি লাগাবেন। কিন্তু কিছুই পারলেন না। এবার আপনার গায়ে কালি লাগবে। এবার আপনার গায়ে কালি লাগবে। চক্রান্ত করার কালি। দিদি ঠিক করে রেখেছে।

আসলে দিদি তদন্ত করতে দিলেও তদন্ত রিপোর্ট আগেই বানিয়ে ফেলেছেন। এবার আপনার বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা হবে। কুণাল ঘোষকে মনে আছে তো! দিদি নিজের ভাইকে যা করেছেন তা তো দেখেছেন। এবার ভাবুন আপনার কী হবে। সব নেতাদের বউরা মামলা করবে। ঘুষ দেওয়ার মামলা। আর প্রতিটি মামলার আলাদা আলাদা তদন্ত হবে। সব রিপোর্ট কিন্তু একই হবে। কারণ, দিদি আগে রিপোর্ট তৈরি করেন তারপরে তদন্তের নির্দেশ দেন।

আমাদের দলেরই পুলিশ রাজীবদাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সবাই জানে শ্রীশ্রী রাজীব কুমার দিদির লোক। নির্বাচন কমিশনও জানে, কেন্দ্রও জানে। কিন্তু কিস্যু করতে পারবে না। এটা দিদির রাজ্য। এখানে দিদিই শেষ কথা। অতএব কী তদন্ত হবে, কে তদন্ত করবে, কীভাবে তদন্ত করবে, তদন্তের ফল কী হবে সবই দিদি ঠিক করবেন। আর কেউ নাক গলাতে পারবে না।

ম্যাথুবাবু, আপনার গোপন ক্যামেরা অভিযানের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পরই বিধানসভা নির্বাচনের আগে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। এবার ফের তোলপাড় হবে। দিদিকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। দিদি তো তদন্তের নির্দেশ দিয়েই বলেছেন, ''প্রতিশ্রুতি ছিল। তা রক্ষা করেছি। কারণ, আমরা চাই সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক। আমি বিশ্বাস করি কোনো চক্রান্ত, কোনো প্ররোচনা আছে কি না, তা খুঁজে দেখা দরকার।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি আপনার কাছে ঘুষ দিতে গিয়েছি, নাকি কেউ আমার কাছে টাকা চেয়েছে...। একটি টিভি তদন্ত করতেই পারে। কিন্তু সেটা কোন প্রসঙ্গে বলছে, তাও দেখতে হবে।''

এটাই প্রমাণ করবেন রাজীব কুমার। বর্তমানে কলকাতার পুলিশ কমিশনার একসময় সারদা-কেলেঙ্কারির তদন্তের দায়িত্বে থাকলেও তা যে বেশি দূর এগোয়নি সেটা জানেন তো ম্যাথুবাবু। সুতরাং বুঝতে পারছেন তো দিদির কথা ছাড়া রাজীব কিছুই করে না। আবার দিদি বললে সঅব করে।

ভোটের আগের দিদি কী বলেছিলেন, সেসব ভাববেন না। ওটা ভোটের ব্যাপার। তখন দিদি বলেছিলেন, ''আগে জানলে প্রার্থী করতাম কি না, ভাবতাম!'' আবার কখনও ভিডিও'কে 'বিকৃত' বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এখন দিদির স্পষ্ট বক্তব্য, ''কারা চক্রান্তের মূলে আছে, তাও দেখতে হবে। সত্যি কেউ দোষী কি না? দোষী হলে আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবে।''

নারদ-কাণ্ডের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, শোভন চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিমের। যাঁরা বর্তমানে রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য। এছাড়াও গোপন ক্যামেরা অভিযানে দেখা গিয়েছিল সাংসদ সৌগত রায়, মুকুল রায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, সুলতান আহমেদ, অপরূপা পোদ্দারকে। বিধায়ক ইকবাল আহমেদ, বর্ধমানের প্রাক্তন পুলিশ সুপার সৈয়দ মহম্মদ হুসেন মির্জা, মদন মিত্রেরও নাম জড়িয়েছিল নারদ-কাণ্ডে। এমনকী, তৎকালীন ছাত্রনেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা, প্রাক্তন যুব তৃণমূল পদাধিকারী কর্ণ শর্মাকে দেখা গিয়েছিল ওই গোপন ক্যামেরা অভিযানে। এত জনকে ফাঁসিয়েও হারাতে পেরেছেন কাউকে। মদনদা হেরেছেন দিদি চেয়েছিলেন বলে। এবার দিদির চাওয়া তদন্তে দিদির চাওয়া রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করুন।

শুনুন দিদি যা ভেবেছেন তাতে চূড়ান্ত না-হলেও জালিয়াতি দমন শাখাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। যে শাখা কলকাতা বন্দরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিংহ কাহালোঁর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগেরও তদন্ত করছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখবেন, ২০১৪ সালে গোপন ক্যামেরায় তোলা তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদদের টাকা নেওয়ার ছবি কেন দু'বছর পর প্রকাশ করা হয়েছে। দু' বছর আগে কেন ওই গোপন ক্যামেরার ছবি তোলার জন্য প্রায় এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল? টাকার উৎস কী? টাকার পিছনে বিদেশি হাত রয়েছে কি না। গত মার্চ মাসে অভিযানের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশের পর আপনি ম্যাথু স্যামুয়েল দেশবিদেশে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাও খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। ফুটেজ প্রকাশের আগে আপনি কাউকে 'ব্ল্যাকমেল' করেছিলেন কি না, তাও তদন্তের আওতায় আসবে। সুতরাং, একটাই কথা তবে রইল। খেলা জমে উঠেছে। নারদ...নারদ...।

— **সুন্দর মৌলিক**

অসম জয়ের তাৎপর্য

সুবীর ভৌমিক

সাম্প্রতিক অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ব্যাপক জয় দেশের শাসক দলের জন্য তিনটি ইঙ্গিত বহন করছে। প্রথমটি হলো, মজবুত রাজনৈতিক সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। অসমে জয় সম্ভব আর পশ্চিমবঙ্গে দলের ভোট বাড়লেও তা সম্ভব নয় কেন? কারণ, অসমে আটের দশক থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রশ্নে আঞ্চলিক রাজনীতির ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আর এস এস এবং অন্য শাখাসংগঠন এবং পরে বিজেপি এক ব্যাপক সংগঠন গড়ে তুলেছে। অসমিয়া, অন্য জনজাতি, বাঙালি এবং হিন্দীভাষী হিন্দুদের মধ্যে এসব সংগঠন ধীরে ধীরে হিন্দুত্বের রাজনীতির এক শক্ত ভিত গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। পরিচিত বামপন্থী সমাজবিজ্ঞানী উদয়ন মিশ্র ইপিডব্লুউ-তে অসমে বিজেপির রাজনৈতিক জয়ে হিন্দুত্বের ছোঁয়া অস্বীকার করে একটি লেখায় বলেছেন, 'রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনীতির ধারাবাহিকতার ফলে এই জয় সম্ভব হয়েছে।' অদ্ভুত যুক্তি! কারণ অসমিয়া 'আঞ্চলিকতার জয়' হলে তো অগপ বিজেপির থেকে বেশি সক্ষম হোত। নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এই আঞ্চলিক ধারাকে বিজেপি সফলভাবে 'হিন্দু সমন্বয়ের' ধারায় উপস্থাপিত করেছে। অসমিয়া, বাঙালি, জনজাতি, হিন্দী ও নেপালি ভাষী হিন্দুদের ভোট এক বাক্সে পড়াতে বিজেপি ব্যাপক জয়ের মুখ দেখেছে। না হলে তা সম্ভব হোত না। এর জন্য ২০০১ সালে জেনারেল এস কে সিনহা যে প্রচেষ্টা করেছিলেন অগপকে বাম দলের থেকে সরিয়ে এনে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত করে, আজ অসম বিজেপি তারই ফসল তুলেছে।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এই প্রথম অসমে বড় ধাক্কা খেয়েছে। মুসলমান ভোট ভাগ হয়েছে আর অসমিয়া মুসলমানদের একটি বড় অংশ স্পষ্টত বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। কংগ্রেস আর AIUDF মুসলমান ভোট ভাগাভাগি করায় তা এক বাক্সে পড়েনি। আর মৌলানা আজমল 'সব মুসলমান এক হও' স্লোগান দিয়েছেন, যার কার্যত কোনো প্রভাব পড়েনি নির্বাচনী ফলাফলের ওপর। কারণ, বাংলাদেশে গত ৬-৭ বছর ধরে আওয়ামি লিগ সরকার থাকায় এবং সাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজনীতির

সর্বানন্দ সোনোয়াল

বিরুদ্ধে সেদেশে সরকারি তৎপরতা থাকায় অসমে বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় রাজনীতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই 'সব মুসলমান এক হও' স্লোগান দিয়ে বিজেপিকে রোখা যায়নি।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ অসমে দলকে জয়ী করতে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে মোদী সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ শুধু বরাক নয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও দলকে জয় এনে দিয়েছে। ১৭ বছরে দুই উপত্যকার মধ্যে ব্রড গেজ-এর কাজ কংগ্রেস সরকার শেষ করতে পারেনি, মোদী সরকার ১৭ মাসে শেষ করেছে। যোগাযোগ যে অঞ্চলে একটি বিরাট সমস্যা, সেখানে এধরনের প্রশাসনিক গতিশীলতার ফল ভাল তো হবেই।

অনেকে মনে করছেন, অসমে বিজেপি নেতৃত্ব নবাগতদের হাতে চলে গিয়েছে, সঙ্ঘ পরিবারের কোনো বর্ষীয়ান স্বয়ংসেবকের হাতে নেই, কথাটা ঠিক। সর্বানন্দ সোনোয়াল, হিমন্ত বিশ্বশর্মা অথবা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা সকলেই অন্য দল থেকে আগত। এটা প্রমাণ করে যে ভারতের মূলভূখণ্ডের থেকে দূরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় নেতৃত্ব ব্যাপারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় ইস্যু, স্থানীয় নেতৃত্ব, স্থানীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব না বুঝলে কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচন জেতা সম্ভব নয়। সে অসম হোক বা পশ্চিমবঙ্গ। স্থানীয় রাজনীতির বড় ইস্যুগুলোতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কোনো জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক দল অসমের মতো রাজ্যে জনমানসে জায়গা করতে পারত না।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল তরুণ প্রজন্মের নেতা, শক্তিশালী স্থানীয় ছাত্র সংগঠন আসু এবং অগপ দুটিরই বড় মাপের নেতা ছিলেন। অর্থাৎ অসমিয়াদের কাছে তিনি 'আমার লড়া' (আমার ছেলে)। আর যে আই এম ডি টি আইনকে অনুপ্রবেশ রোখার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হোত, তা খারিজ করার জন্য নিরলস আইনি লড়াই চালিয়ে সাফল্য পাওয়ার জন্য অসমে অনেকের কাছেই তিনি 'জাতীয় বীর'। তাঁর ওপর রাজ্যবাসীর অনেক আশা। সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোখার জন্য তিনি কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন, এটা অনেকেই আশা করছেন। এ ব্যাপারে সোনোয়ালকে বুঝতে হবে, যারা বাংলাদেশিদের বৈধ কাগজপত্র দিয়ে অসমবাসী বানায়, তারা বেশিরভাগ অসমিয়া। নিচু-উঁচুতলার দুর্নীতিবাজ আমলা। তাই সোনোয়ালকে সার্বিকভাবে অসমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। এই আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বন্ধ না করতে পারলে সোনোয়ালের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই প্রধানমন্ত্রীর পথ অনুসরণ করে সোনোয়ালকেও মোদীর মতো স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে অসমে।

(লেখক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্বভারতের রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

অসমে নতুন উদ্যম, নতুন প্রত্যাশা

বাসুদেব পাল

লাগাতার তিন দফায় একই দলের সরকারই শুধু নয়, মুখ্যমন্ত্রীও একই ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও অসমের আর্থিক উন্নয়ন এখনও অধরা। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বিপুল জয় অসমে জনগণের প্রত্যাশাকে আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এনডিএ সরকার উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে যতটা সক্রিয়তা দেখিয়েছে তা এর আগে দীর্ঘকাল একই দল রাজ্যে ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও হয়নি। প্রথমেই বলা যেতে পারে— DONER (Development of the North East Region)-এর কথা। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে DONER-র দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য এবং তার সঙ্গে সিকিমকে ধরে মোট আটটি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই ডোনার-এর গঠন। সিকিমের মতো ছোটো রাজ্য এক্ষেত্রে বেশ সফল বলা যেতে পারে। ১৯৭৮ সালে মঙ্গলদই লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে হঠাৎ ব্যাপক সংখ্যায় ভোটার বৃদ্ধি ভূমিপুত্র অসমিয়া ভাষীদের মনে অস্তিত্ব সঙ্কটের এক প্রবল প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়। শুরু হয় বিদেশিদের (পড়ুন বাংলাদেশি) নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবিতে ব্যাপক ও মর্মস্পর্শী জন-আন্দোলন। আন্দোলনের নেতৃত্বে সর্বজন পরিচিত ছাত্র সংগঠন— অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। এই আন্দোলন চলতে থাকে অসম গণ পরিষদ (অগপ) রাজনৈতিক দল গঠন ও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত। যদিও কয়েকটা অনভিজ্ঞতা এবং ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা থাকার কারণে সরকারের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। আশাহত আমজনতা আবার কংগ্রেসকেই অসমে ক্ষমতায় বসায়। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ওই আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশই ভূমিগত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম অসমের স্বপ্ন দেখতে থাকেন এবং নিয়মিত অন্তর্ঘাত চালাতে থাকেন। চীন ও বাংলাদেশের আশ্রয় প্রশ্রয় ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করা তাদের ক্রূর ও হিংস্র ভারতবিরোধী মানসিকতার পরিচয় দেয়। যদিও ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে অসমের শিবসাগর জেলার রংঘর নামক স্থানে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম বা ইউএলএফএ-র গঠন হয়েছিল। ২০০৭-এ বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আওয়ামি লীগ সরকারের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া উল্ফার একাদশ শীর্ষ নেতৃত্বের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ (শর্তাধীন?) পর্যন্ত অন্তর্ঘাত, বিস্ফোরণ, নিরাপত্তাবাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালু ছিল নিত্য নিয়মিত। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০০৩-এ ভুটানের জঙ্গলে ইউএলএফএ-র ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো ভারতের প্রবল চাপে রয়েল ভুটান আর্মি ভেঙে দেয়। ব্যাপক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার হয়। প্রায় চারশত জঙ্গি

“অসমে ব্যাপক পরিমাণে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এক বিকট সমস্যা। বর্তমান সরকার ওই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে সর্বতো প্রয়াসী হবেন— এটা আশা করা যেতেই পারে।”

আত্মসমর্পণ করে। ধরা পড়েন ইউএল এফ এ-র তাত্ত্বিক নেতা ভীমকান্ত বরগোহাঞি। তবে ইউএলএফএ-র কমান্ডার ইন চিফ পরেশ বরুয়াকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী ধরতে পারেনি। এসব কথা বলার তাৎপর্য হলো, নাগরিক জীবন যখন সুস্থির ও স্বাভাবিক থাকে তখনই সার্বিক উন্নয়ন হতে পারে। এর সঙ্গে উন্নয়নের জন্য আরও একটি বিষয় আবশ্যিক, তা হলো দক্ষ প্রশাসন। এর বিপরীত হলে দেখা যায়, সার্বিক উন্নয়নের বদলে ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিশেষের উন্নয়নের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। আর দারিদ্র্যসীমার (বিপিএল) নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

এর পরেও রয়েছে আমলাতন্ত্র বা সরকারি অফিসার মহলে সীমাহীন লাগামছাড়া দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ। আগের গগৈ সরকারের (২০০১-২০০৬) আমলে উত্তরকাছাড় পার্বত্য জেলার (স্বশাসিত) মুখ্য কার্যনির্বাহী কোনো এক উগ্রপন্থী দলকে নগদ প্রায় এক কোটি টাকা দিতে যাওয়ার সময় ওই টাকা-সহ অসম-মেঘালয় সীমান্তে ধরা পড়েন। পরে তিনি শাসক কংগ্রেস দলে যোগ দেন আত্মরক্ষার তাগিদে। অতি সম্প্রতি হেমাজি জেলার বিভাগীয় আধিকারিক (বিএফও) মহৎ চন্দ্র তালুকদার ১৪ জুন ঘুষ নিতে গিয়ে নিজ কার্যালয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন। অ্যান্টি করাপশান ডেভলপমেন্ট-এর অফিসাররা তাঁর গুয়াহাটির প্রাসাদোপম অট্টালিকায় হানা দিয়ে নগদ আড়াই কোটি টাকা এবং এক কিলো ষাট গ্রাম সোনা উদ্ধার করে তাজ্জব হয়ে যান। সরকারি অফিসার মহৎচন্দ্রের বাড়ি থেকে বিশালাকার বাঘের চামড়া, হরিণের চামড়া এবং হাতির দাঁতও পাওয়া গেছে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত অভয়ারণ্য কাজিরাঙ্গার রেঞ্জার ছিলেন মহৎচন্দ্র তালুকদার। ওই সময়ে চোরা শিকারিদের হাতে ১৮২টি গণ্ডার মারা পড়ে। এরকম মহৎচন্দ্র নিশ্চয়ই একা বা একজন নেই। খবরে প্রকাশ ঢেনাজিতে ট্রান্সফারের জন্য তিনি নাকি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন।

এ সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্যে এনডিএ সরকার। নতুন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা। অসমের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে (দাবি) শ্রী সোনোয়াল স্মারকলিপি দিয়েছেন কেন্দ্রের কাছে। ২৬,২২৬ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। অপরিশোধিত তেলের রয়ালিটি বাবদ ১০ হাজার কোটি টাকা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ১২২৬ কোটি টাকা চেয়েছেন। নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন— তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার উত্তরাধিকারীর জন্য বিরাট আর্থিক বোঝা রেখে গেছে। এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন— ২০১১-র অর্থ বছরে রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৮,৫৬২ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬-তে তা বেড়ে হয়েছে ৮৮ শতাংশ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অসমে উন্নয়নের নিরিখে পাবলিক ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কাজের গতি অনেক শ্লথ। কিছু বরাদ্দ থাকে যা সময়ে শেষ করতে না পারলে তা ফেরত যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে রাজ্যকেও একটা ম্যাচিং গ্রান্টস্ দিতে হয়। অতীতে দুটো থেকেই অনেক উদাহরণ দেখা গেছে। এছাড়া অসমে ব্যাপক পরিমাণে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এক বিকট সমস্যা। বর্তমান সরকার ওই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে সর্বতো প্রয়াসী হবেন— এটা আশা করা যেতেই পারে। অসমে কোনো বড় কারখানা প্রায় নেই। সেজন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। সন্ত্রাস ও ভ্রষ্টাচার পরিব্যাপ্ত হলে কোনো বড় বিনিয়োগ আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রয়াসী হয়ে অসমকে উন্নত ও বিকশিত রাজ্যের তালিকায় সামিল করবেন— এটাই সবার আশা এবং সময়ের আহ্বান।

১০০ দিনের মধ্যে এন আর সি-র কাজ শেষ করতে হবে : সোনোয়াল

১০০ দিনের মধ্যে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনস্ (এন আর সি)-র কাজ শেষ করতে হবে— অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের এই ঘোষণায় কংগ্রেস আতঙ্কিত। গত ১৩ জুন করিমগঞ্জে নব নির্বাচিত বিধায়কদের সংবর্ধনা সভায় বলা হয় একজনও বাঙালি মুসলমান এন আর সি থেকে বাদ পড়লে ফল খারাপ হবে। এই সংবর্ধনা সভায় শিলচরের সাংসদ সুস্মিতা দেব, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা ও বদরপুরের বিধায়ক জামালউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। একমাত্র উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর এলাকারই সীমাবর্তী গ্রামগুলিতে বাংলাদেশি মুসলমানরা আত্মীয় পরিচয়ে বসবাস করছে।

সূত্রে প্রকাশ, এন আর সি-র জাল নথি প্রায় সব জেলাতেই জমা পড়েছে। নতুন সরকার এসে স্কুটিনি করাতে সব ধরা পড়ছে। এর ফলে প্রতিদিন থানায় থানায় মামলা চলছে। এন আর সি-র দায়িত্বে থাকা আধিকারিক হিতেশ দেবশর্মা বলেন, যাদের নথি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে, তারা সবাই সন্দেহভাজন নয়। দালালদের খপ্পরে পড়ে অনেকেই জাল নথি জমা দিয়েছেন। দপ্তরের আশা তারা আগামী অক্টোবর মাসেই এন আর সি-র খসড়া প্রকাশ করতে পারবেন।

অনুপ্রবেশ রোখাই অসমে নতুন সরকারের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ

অভিমন্যু গুহ

অসমে বিজেপি সরকার প্রথমবারের জন্য ক্ষমতায় আসার মধ্যে ভারতের অখণ্ডতার প্রশ্নটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উত্তর-পূর্ব ভারতকে ভারতবর্ষের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কৌশল এদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বহুদিনের। সারা দেশেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যেভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে এবং ভোট-লোলুপ সুবিধাবাদী একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল যখন তাদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করতে এদের মদত দিচ্ছে তখন অসমের পর মণিপুরেও জাতীয়তাবাদের দৃঢ় পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই ভারতবর্ষের অখণ্ড সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করবে। তবে অসমের সর্বানন্দ সোনোয়ালের নতুন সরকারের সামনে এই মুহূর্তে কঠিনতম কাজ অনুপ্রবেশ-কবলিত অসমকে অনুপ্রবেশ-মুক্ত করা।

২০০৪ সালে সংসদে প্রদত্ত এক তথ্যে কেন্দ্র জানায় ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী অসমে প্রায় ৫০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। ২০১২ সালের অক্টোবরে অসম সরকার যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় ১৯৮৫ থেকে ২০১২, সরকারি হিসেবেই মাত্র ২৪৪২ জন অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো গিয়েছে এই ২৭ বছরে। সুতরাং পরিস্থিতি আজ কোন ভয়াবহ দিকে মোড় নিয়েছে, তা বোঝাই যায়। পরিস্থিতিটা কিন্তু এমন ছিল না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এর অবনমন শুরু হয়। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬— এই ৫ বছরে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়ন করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৫ থেকে ২০১২— এই ২৭ বছরে সেই সংখ্যার করুণ হাল আমরা আগেই দেখেছি। ১৯৯২ সালে অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সাইকিয়া স্বীকার করে নেন যে সেই সময় ওই রাজ্যে বে-আইনি অনুপ্রবেশকারী ছিল প্রায় ৩৩ লক্ষের মতো। আর এই সূত্রে কেন্দ্রের পূর্বোক্ত পরিসংখ্যানই দেখিয়ে দিচ্ছে ২০০১ সালে মাত্র নয় বছরের মধ্যে অসমে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৭ লক্ষ।

বি এস এফ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনারত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সোনোয়াল।

২০০১ থেকে ২০১৬— এই পনেরো বছরে অসমে কী হারে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়েছে তা কল্পনা করতেও আতঙ্কিত হতে হয়। বিশেষ করে এই পর্বে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তরুণ গগৈ। অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধানে তিনি কী নক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছিলেন তা সকলেরই জানা। ২০১২ সালের ২০ অক্টোবর অসম সরকার প্রকাশ করে একটি শ্বেতপত্র— 'হোয়াইট পেপার অন ফরেনার্স ইস্যু'। সেখানে সরকার অনুপ্রবেশ বিষয়টি নিয়ে নীরব থেকেই শুধু সন্তুষ্ট হয়নি, উপরন্তু জানিয়ে দেওয়া হয় অসমে কোনো বিদেশি (পড়ুন অনুপ্রবেশকারী) পাকাপাকিভাবে নেই। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ একটি জনসভায় সদম্ভে ঘোষণা পর্যন্ত করে দেন যে অসমে কোনো বাংলাদেশি থাকেন না।

সমস্যার সূত্রপাত ১৯৮৩ সালে গৃহীত আই এম ডি টি (ইল্লিগাল মাইগ্রেন্টস ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইব্যুনাল) আইনে। যাতে বলা হয় বিনা প্রমাণে কারোকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। ফলত প্রমাণের অভাবে বহু অনুপ্রবেশকারীই ছাড় পেয়ে যায়, আর সুবিধেবাদী রাজনীতির সুযোগে অনেক অনুপ্রবেশকারীর এদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণেও বিশেষ অসুবিধা হয়নি। সবমিলিয়ে এই আইনের গেরোয় অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কাজটি আটকে যায়। ২০০৫ সালের জুলাইয়ে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ও এই আইনের মান্যতা স্বীকার করে নেয়। ফলে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে যায়।

কিন্তু পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তা একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী অসমের জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে ৩৯৭ জন) এমনিতেই জাতীয় গড় (প্রতি বর্গকিমিতে ৩৮৩ জন)-এর থেকে বেশ বেশি। কিন্তু কিছু জেলায় এই পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আঁতকে উঠতে হয়। প্রতি বর্গকিমিতে অসমের

সীমান্ত সংলগ্ন চারটি জেলা গোয়ালপাড়া, করিমগঞ্জ, নগাঁও ও ধুবড়ির জনঘনত্ব যথাক্রমে ৫৫৩, ৬৭৩, ৭১১ ও ১১৭১। সমস্যাটা যে অনুপ্রবেশেরই, তা এতে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। আরও একটা মারাত্মক তথ্য দেওয়া যাক, ২০০১ থেকে ২০১১— এই দশ বছরে অসমে জনবৃদ্ধির হার (১৬.৯৩ শতাংশ) জাতীয় গড় (১৭.৬৪ শতাংশ)-এর থেকে কম। অথচ অসমের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এই হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি। যেমন ধুবড়িতে ২৪.৪০ শতাংশ, গোয়ালপাড়ায় ২২.৭৪ শতাংশ, বরপেটায় ২১.৪০ শতাংশ হাইলাকান্দিতে ২১.৪৪ শতাংশ এবং করিমগঞ্জে ২০.৭৪ শতাংশ। অথচ সীমান্ত থেকে দূরবর্তী অসমের অন্যান্য জেলাতে এই জনবৃদ্ধির হার বেশ কম। যেমন শিবসাগরে ৯.৩৭ শতাংশ, জোরহাটে ৯.২১ শতাংশ, গোলাঘাটে ১১.৮৮ শতাংশ ইত্যাদি।

অনুপ্রবেশের ভয়াবহতার এর চেয়েও বড়ো প্রমাণ হচ্ছে সীমান্ত জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ১৯৭১ থেকে ২০০১ এই ত্রিশ বছরে ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, দরাং, মরিগাঁও ও করিমগঞ্জে মুসলমান জনবৃদ্ধির হিসাব যথাক্রমে ১০ শতাংশ, ১২.২ শতাংশ, ১০.৮ শতাংশ, ১১.৬ শতাংশ, ৭ শতাংশ ও ৮ শতাংশেরও বেশি। ১৯৭১ থেকে ২০০১— এই সময়ে (গত তিরিশ বছরে) অসমে হিন্দু জনসংখ্যার শতাংশ যেমন কমেছে (৭২.৫ থেকে ৬৪.৯), একইভাবে মুসলমান জনসংখ্যারও বৃদ্ধি সেভাবেই হয়েছে (২৪.৬ শতাংশ থেকে ৩০.৯ শতাংশ)। ২০১১-র জনগণনায় এই বৃদ্ধি ৩২.৪০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছে বলে অনুমান। সবদিক খতিয়ে দেখে নাথ অ্যান্ড নাথের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ২০৪০-এর মধ্যে অসমে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হবেন, অন্যদিকে ইন্দ্রজিত বড়ুয়ার সমীক্ষায় এই সময়সীমা বেড়ে ২০৪৭ হয়েছে। প্রশ্নটা হিন্দু-মুসলমানের নয়। কিন্তু হিন্দু শরণার্থীদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত সরকার ও অসমের কংগ্রেস সরকার বরাবরই বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছে। ভোটব্যাঙ্কের লোভে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি এদের নরম মনোভাব অসমকে একদিকে যেমন আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি ও দেশের নিরাপত্তারও চূড়ান্ত ক্ষতি করেছে। এই সূত্রেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার সময় যেখানে অসমের একটি জেলাও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না, সেখানে আজ অসমের ২৩টি জেলার মধ্যে ছ'টিই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাকি অনেকগুলি জেলাও সেইদিকেই এগোচ্ছে।

একটা সময় বলা হচ্ছিল যে অনুপ্রবেশকারীরাই অসমের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবে। এই আশঙ্কা যে খুব ভুল ছিল না তা প্রমাণ করে দিয়েছে বদরুদ্দিন আজমলের এ আই ইউ ডি এফ। পুরো অনুপ্রবেশকারীদের ভোট-পুষ্ট এই দলটির আসন সংখ্যা এবার পাঁচটি কমে তেরোতে এসে ঠেকলেও ১৩ শতাংশ ভোট এখনও তাদের রয়েছে। কংগ্রেসের জোটের পক্ষে যাওয়া ৩১ শতাংশ ভোটের মধ্যেও যে অনুপ্রবেশকারীদেরও একটা ভোটব্যাঙ্ক লুকিয়ে রয়েছে তাও নিশ্চিত। বিশেষ করে অসমের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসনেতা তরুণ গগৈ একটা সময় অনুপ্রবেশকারীদের 'রক্ষাকর্তা' হিসেবে চিহ্নিত হতেন।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিষয় হলো অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অসমবাসীর একজোট হওয়া ফলত এবারের নির্বাচন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয় নাগরিক বনাম বিদেশিদের ভোটের লড়াই। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী শক্তির এই বিপুল জয় অনুপ্রবেশকারীরা তো বটেই, চীন-পাকিস্তান সহ আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা উগ্রপন্থী কেউই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারবে না। পদে পদে রাজ্য তথা দেশকে অশান্ত করতে চাইবে। সুতরাং অসমের বিজেপি সরকারের কাঁধে এখন গুরুদায়িত্ব। অনুপ্রবেশ সমস্যাকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করাই যে তাঁর মুখ্য কাজ তা ক্ষমতায় বসেই বুঝিয়ে দিয়েছেন সর্বানন্দ সোনোওয়াল। আর এক্ষেত্রে তাঁর মস্ত সহায় যে কেন্দ্রের জাতীয়তাবাদী সরকার তাও স্পষ্ট। সুতরাং কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুপ্রবেশ-মুক্ত, উগ্রপন্থী-ভয়াবহতা মুক্ত, বিচ্ছিন্নতাবাদী মুক্ত ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হিসেবে নতুন অসম গড়ে উঠবে তা আশা করা যেতেই পারে। অসমবাসীরা সেদিকেই বোধহয় তাকিয়ে রয়েছেন। আর নিন্দুকদের কপালে শুধুই দীর্ঘতর শ্বাস! ■

সারণি

রাজ্য/জেলা	জনগণনা ১৯৭১		জনগণনা ১৯৯১		জনগণনা ২০০১	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
অসম রাজ্য	৭২.৫	২৪.৬	৬৭.১	২৮.৪	৬৫.৯	৩০.৯
ধুবড়ি	৩৪.৮	৬৪.৫	২৮.৭	৭০.৫	২৪.৭	৭৪.৩
গোয়ালপাড়া	৫০.১	৪১.৫	৩৯.৫	৫০.২	৩৮.২	৫৩.৭
বরপেটা	৫১.১	৪৮.৬	৪০.৪	৫৬.১	৪০.২	৫৯.৫
দরাং	৭০.৩	২৩.৯	৬০.৫	৩২	৫৭.৭	৩৫.৫
মরিগাঁও	৫৯.৪	৪০.৪	৫৪.৬	৪৫.৩	৫২.২	৪৭.৬
নগাঁও	৫৯.৬	৩৯.২	৫১.৭	৪৭.২	৪৭.৮	৫১
করিমগঞ্জ	৫৫.১	৪৪.২	৫০.১	৪৯.২	৪৬.৭	৫২.৩
হাইলাকান্দি	৪৭.৫	৫১.৪	৪৩.৭	৫৪.৮	৪১.১	৫৭.৬
কাছাড়	৬৫.৪	৩২.৫	৬৩.৪	৩৪.৫	৬১.৪	৩৬.১

বি. দ্র. : শতাংশের হারে জনগণনার এই হিসাব দেখানো হয়েছে।

জাতীয় ও আঞ্চলিক সত্তার সমন্বয়ে যে জয় তা ধরে রাখার উপরেই সর্বানন্দ সরকারের সাফল্য নির্ভর করছে

সন্দীপ চক্রবর্তী

অসমের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয় এবং দুই সহযোগীকে নিয়ে সরকার গঠন বেশ কয়েকটি সদর্থক চিন্তাভাবনার ফসল। কোনো কোনো পর্যবেক্ষক বিজেপির কৃতিত্বকে খাটো করে দেখানোর উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করেছেন, এবার অসমে বিজেপি জেতেনি, কংগ্রেস হেরেছে। তার কারণ ১৫ বছর ধরে চলা কংগ্রেসের শাসন, তরুণ গগৈ মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যের বেলাগাম দুর্নীতি এবং সেইজন্য অসমের মানুষের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মনোভাব। কিন্তু একটা কথা এঁরা ইচ্ছা করেই বলছেন না গত পাঁচ বছরে বিজেপি যেভাবে অসমের মূলস্রোতে মিশে গেছে কংগ্রেস কোনোদিনই তা পারেনি। কংগ্রেস বরাবর হিন্দু অসমিয়া ও হিন্দু বাঙালির ভাষাগত দূরত্ব এবং হিন্দু মুসলমানের চিরাচরিত বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে বিভেদের রাজনীতি করেছে। অন্যদিকে বিজেপি করেছে সমন্বয়ের রাজনীতি। দীর্ঘদিন ধরে যুযুধান অসমীয়া ও বাংলাভাষী মানুষের ঐক্যসাধনে তা যে কার্যকরী হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সেইসঙ্গে অসমের একাধিক জেলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ইসলামিক স্টেটের মদতপুষ্ট জেহাদিদের উপদ্রব বিজেপির জয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আজকাল একটা শিশুও একথা জানে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় বিজেপিই একমাত্র ভরসা। বৃটিশ উপনিবেশবাদের ছায়ায় প্রতিপালিত এ দেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ভোটব্যাঙ্ক হারাবার ভয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ করবে না। সুতরাং অসমে বিজেপির জয় মোটেই নেতিবাচক ভোটের ফল নয়।

২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বিজেপি অসমের জেলায় জেলায় তাদের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের কর্মসূচি তুলে ধরেছিল। এরই সূত্র ধরে অসমের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির মেলবন্ধন শুরু হয়। ষোড়শ শতকের অসমের (তৎকালীন অহম) হিন্দু সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিৎ শঙ্করদেবকে হিন্দু জাতীয়তার মুখ

শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত পাটবাউসি সত্র।

> অসমে বিজেপির নির্বাচনী জয়লাভ ভারতের রাজনীতিতে একটি বিশেষ মাইলফলক। এই জয় প্রমাণ করেছে বিজেপির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ। কিন্তু দেশের প্রতিটি রাজ্যের ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যকে চিরকাল বেঁধে রেখেছে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণায় ঐক্যসূত্রটি স্পষ্টতই হিন্দুত্ব।

হিসেবে তুলে ধরা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শিবসাগরে অনুষ্ঠিত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সঙ্ঘের ৮৫ তম সম্মেলনে যোগদান করে অসমিয়া কিংবদন্তীকে সম্মান জানান। বস্তুত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে মূলের সমন্বয় সাধন খুবই জরুরি। উপেক্ষিত শঙ্করদেবকে অসমীয়া জনমানসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বিজেপি সারা ভারতবর্ষকে এই বার্তা দিয়েছে তারা মোটেই শুধু হিন্দিবলয়ের ধ্বজাধারী নয়। সেই সঙ্গে এও দেখিয়েছে শঙ্করদেবের মঠ ও মন্দির কীভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে গেছে।

অনুপ্রবেশ অসমের একটি পুরনো সমস্যা। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা এবং অসম— সকলেই এই সমস্যায় জেরবার। অসমের অন্তত পাঁচটি জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাধিক্যে হিন্দুদের চেয়ে এগিয়ে। যারা এসেছে তাদের বেশিরভাগই জামাতের লোক বলে অভিযোগ। জামাতের অন্যতম ঘোষিত নীতিই হলো, বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও অসমকে নিয়ে অখণ্ড ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সন্ত্রাসবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অবস্থা ভয়াবহ। বিজেপির দুই জোট সহযোগী অগপ এবং বিপিএফ দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি যখন ইস্যুটিকে নিজেদের নির্বাচনী অ্যাজেন্ডায় রাখল এবং সর্বানন্দ সোনোয়াল (তৎকালীন অসম-বিজেপির রাজ্যসভাপতি, অধুনা অসমের মুখ্যমন্ত্রী) অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন চাইলেন তখনই অসমের স্থানীয় রাজনীতির শরিক হয়ে উঠল দল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাংলাদেশি ভোটারদের (মূলত মুসলমানদের) ভারতে নিরাপদে থাকতে দেওয়ার জন্য আইনটি করেছিলেন। এই আইনের ফলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বোড়োরা। শুরু হয় বোড়ো আন্দোলন। যাই হোক, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু অসমিয়াদের অসন্তোষ ছিলই। সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বে বিজেপি শুধু সেই অসন্তোষকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে পরিণত করেছে।

বিজেপির হিন্দুভোট একত্রীকরণের লক্ষ্য কিছুটা সহজ হয়ে যায় বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (এ আই ইউ ডি এফ) উত্থানে। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত দলটি ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছিল। ভোট পেয়েছিল ১৩ শতাংশ, যা সে বছর বিজেপির পাওয়া ভোটের থেকে ১ শতাংশ বেশি। নির্বাচনী প্রচারে বদরুদ্দিন আজমল ও তার অনুগামীরা নিজেদের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত দল বলে জাহির করতেন। শুধু তাই নয়, নিজেকে 'কিংমেকার' ভাবা বদরুদ্দিন এও বলতেন, তার দল বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে অসমে আসা মুসলমানদের দল। অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে তিনি আহ্বান জানান তার দলের সঙ্গে জোট বাঁধার জন্য। উদ্দেশ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। অসমের মানুষ এদের ক্ষমা করেননি। বদরুদ্দিন ধরাশায়ী হয়েছেন। কংগ্রেসও পার পায়নি। অথচ ২০১১-র ছবিটা এরকম ছিল না। আসুর বিখ্যাত 'বাঙালি খেদাও' আন্দোলনে বিপর্যস্ত বাঙালিরা পাশে থাকলেও অসমের ভূমিপুত্র অসমিয়ারা তখনও পর্যন্ত ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। সেবার বিজেপি অসমীয়া ভোট পেয়েছিল মাত্র ১০ শতাংশ আর বাঙালি ভোট ৪২ শতাংশ। ২০১৬-র নির্বাচনে ভোটপ্রাপ্তির হার বেড়ে দাঁড়াল যথাক্রমে ৪৩ এবং ৫৪ শতাংশ। অর্থাৎ ভাষাগত বিভাজনের থেকে বড়ো হয়ে দাঁড়াল সন্ত্রাস এবং মুসলমানদের কাছে ধন-মান-প্রাণ হারানোর ভয়। অসমের রাজ্য বিজেপির দায়িত্ব নিয়েই সর্বানন্দ সোনোয়াল ঘোষণা করেন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ হবে 'দ্বিতীয় সরাইঘাটের যুদ্ধ'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৬৭১ সালে প্রথম সরাইঘাটের যুদ্ধে অহম রাজ্যের সেনাপতি লাচিৎ বড়ফুকন মুঘল সেনাপতি মীর জুমলাকে পরাস্ত করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি নেতৃত্বের এই মনোভাবে অসমের মানুষ আকৃষ্ট হন। বস্তুত এই প্রথম কোনো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল স্থানীয় ইস্যুগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে অসমের মানুষের পাশে দাঁড়াল। ভারতবর্ষে জোট রাজনীতির এটাই এখন দস্তুর। স্থানীয় রাজনীতিকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা চলবে না। বিজেপি সবার আগে কথাটা বুঝেছে তাই সবার আগে ফল পাচ্ছে। এর মধ্যে নেতিবাচক ভাবনার কোনো স্থান নেই।

তবে এখানে একটা কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, সঙ্ঘ পরিবারের সাহায্য ছাড়া বিজেপির এই রাজকীয় উত্থান সম্ভব হোত না। ১৯৪৬ সাল থেকে সঙ্ঘ পরিবার অসমে সক্রিয়। প্রায় ৮৫০ শাখার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত চলছে সমাজ-সংস্কৃতির পরিচর্চা। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মতো সংগঠন জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, সেবাধর্মী হিন্দুত্বের ছায়াকে আরও প্রসারিত করা যাতে ভাষা-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে এই ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে।

অসমে বিজেপির নির্বাচনী জয়লাভ ভারতের রাজনীতিতে একটি বিশেষ মাইলফলক। এই জয় প্রমাণ করেছে বিজেপির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ। কিন্তু দেশের প্রতিটি রাজ্যের ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যকে চিরকাল বেঁধে রেখেছে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণায় ঐক্যসূত্রটি স্পষ্টতই হিন্দুত্ব। যে কারণে প্রায় ১২০০ বছরের পরাধীনতাও এদেশকে ভাঙতে পারেনি। ঐক্যসূত্রটি আরও মজবুত করা প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তরকালে ভোটের জন্য কংগ্রেস ও তার দোসর বামদলগুলির নির্বিচার মুসলমান তোষণ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক ব্রাদারহুডের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ধ্বংসোন্মত্ততায় ভারতীয়ত্ব আজ বহুধা বিভক্ত। ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই অখণ্ড ভারতীয় জাতিসত্তা নির্মাণের দায় নিতে হবে বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারকে। সেই নির্মাণের ভিত হবে হিন্দুত্ব— এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ■

বিজেপির উত্থান

এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি আসনে জয়ী হয়ে বিজেপি বুঝিয়ে দিল যে আগামী দিনে তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে তারাই প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে। আরও কয়েকটি আসন অল্পের জন্য হাতছাড়া না হলে বিজেপির আসনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেত। তৃণমূলী সন্ত্রাস, নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও এই জয় নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে তা বলা যায়। ভুললে চলবে না এরাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা এখনও প্রকট। এর আগে বিধানসভার উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হলেও এই প্রথম সরাসরি নির্বাচনে জিতে বিধানসভার আসন অলঙ্কৃত করবেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলের তিন বিধায়ক। তবে সামগ্রিকভাবে উত্তরপূর্ব ভারতে বিজেপির অভাবনীয় সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'আচ্ছে দিন'-এর তত্ত্বই প্রমাণিত হয়। স্বাধীনতার পর এই প্রথম অসমে সরকার গড়ায় গরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। অসমে এর আগের বিধানসভায় ৫টি আসন থেকে বিজেপি এবার একাই ৬০টি আসন পেল। লোকসভায় একসময় ২টি আসন থেকে পরবর্তী নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হয়েছিল। তাহলে এই পথেই পশ্চিমবঙ্গে ৩টি আসন থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে সরকার গড়তে পারবে না তা কে বলতে পারে? এরাজ্যের মানুষ বুঝে গিয়েছেন যে নীতি- আদর্শহীন ক্ষণিকের কংগ্রেস সিপিএম জোটকে দিয়ে তৃণমূল সরকারকে সরানো যাবে না। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই জনার্দন। মানুষ চায় দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন। বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির সুশাসন দেখে মানুষ বিজেপির ওপর আস্থা রাখতে চাইছে। কিন্তু মানুষের আশা বিশ্বাসকে ভোটে পরিণত করতে গেলে প্রয়োজন সংগঠন শক্তির। তবেই এরাজ্যে বিজেপির

অনুকূলে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে সুবিধা হবে।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

সঙ্ঘ মুক্ত ভারত

বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার 'সঙ্ঘ মুক্ত ভারত' গড়ার ডাক দিয়েছেন। আমরা বলব জোর কদমে সচেষ্ট হন। তাহলে বুঝতে পারবেন কী দুরহ কাজ! আশা করি ব্যর্থ হলে মনের কষ্টে ভুগবেন না। ১৯৪৮ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহরলাল নেহরু একবার চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধী হত্যার অপবাদ দিয়ে, সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে ভেবেছিলেন সঙ্ঘকে গ্রাস করে নেবেন। সঙ্ঘের অহিংস সত্যাগ্রহীদের কাছে পরাভূত হয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলতে বাধ্য হন। ১৯৭৫ সালে নেহরুকন্যা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিরোধী নেতা রাজনারায়ণের কাছে মামলায় হেরে গিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। রাতারাতি কালাকানুন জারি করেন। সঙ্ঘকে বে-আইনি ঘোষণা করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বা রাজ্যস্তরের বহু কার্যকর্তাকে বন্দি করে কারান্তরালে থাকতে বাধ্য করেন। ভারতব্যাপী অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহী বন্দিজীবন গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে দলের সঙ্গে নিজেও নির্বাচনে পরাভূত হয়ে সঙ্ঘের উপর প্রতিবন্ধকতা তুলতে বাধ্য হন। শ্রীমতী গান্ধী নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আমার জীবনে বিরাট ভুল। আজ সঙ্ঘের কর্মকাণ্ড যেভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করেছে সঙ্ঘের কার্যকর্তা ও জীবনব্রতী প্রচারকদের পরিশ্রমে তাকে ধ্বংস করা কীভাবে সম্ভব নীতীশজী ভেবে দেখেছেন কী? 'সঙ্ঘ মুক্ত ভারত' করবেন, কীভাবে? সঙ্ঘ কার্য সমগ্র ভারতীয় সমাজে বিস্তারিত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে শিক্ষাজগতে সাড়া জাগানো সঙ্ঘ সহযোগী সংগঠন 'বিদ্যাভারতী' যার তত্ত্বাবধানে পঁচিশ হাজার শিশু মন্দির, বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়) চলছে। এছাড়া সারাদেশে প্রায় লক্ষাধিক এক শিক্ষক বিদ্যালয় (একল বিদ্যালয়)নিশুল্ক ভাবে পরিচালিত হয়। ওই সকল শিক্ষানিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক, অভিভাবিকা সকলে সঙ্ঘের আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবধারায় ভাবিত ও সংগঠিত। এছাড়া বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, ভারতের জনজাতি বনবাসী, গিরিবাসী এদের সংগঠন। আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ সঙ্ঘ আদর্শ চিন্তা ধারায় অনুপ্রাণিত। বিবেকানন্দকেন্দ্র কন্যাকুমারী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমগ্র বিশ্বে হিন্দুদের ও সাধু সন্ত মহাপুরুষদের সংগঠন, তাও সঙ্ঘের আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতির আধারে পরিচালিত।

এছাড়া ভারতীয় সমাজে শত শত ছোটবড় অসংখ্য সংগঠন আছে যা সঙ্ঘের আদর্শ, চিন্তাধারা, সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। যেমন, সেবা ভারতী, সংস্কৃত ভারতী, সংস্কার ভারতী, বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজুরসঙ্ঘ, শিক্ষক সংগঠন, অধিবক্তা পরিষদ, আরোগ্য ভারতী, ক্রীড়া ভারতী ইত্যাদি। এইসব সংগঠন সমগ্র ভারতে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মরত ও শক্তিশালী সংগঠন রূপে পরিচিত।

আপনার কাছে বিনম্র নিবেদন, আপনি প্রথমে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মুক্ত ভারত করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ করুন। কারণ ভাজপা সঙ্ঘ আদর্শবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল। ওই সংগঠনকে ভারতমুক্ত করে, নিজে জয়যুক্ত হয়ে, প্রধানমন্ত্রীর আসনে সমাসীন হয়ে, সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা লাগু করে দেখতে পারেন 'সঙ্ঘ মুক্ত ভারত' করা যায় কিনা? আপনি আপনার অভিষ্ট লক্ষ্যে আগুয়ান হোন।

—**লক্ষ্মণ বিষ্ণু,**
সিউড়ী, বীরভূম।

ধর্মান্তরকরণের প্রতিকার চাই

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধ্বজাধারীরা প্রতিনিয়ত হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুয়াতে (বেরুইমোড়, মন্ডলাই, হুগলী জেলা) যেভাবে আমাদের বনবাসী ভাই বোনদের 'হোলি ক্রস স্কুল'-এর মাধ্যমে সুনিপুণভাবে ধর্মান্তরকরণ করা হচ্ছে তা একেবারেই ভারতীয় সভ্য সমাজে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। শুধু তাই নয়, এই নিরিখে আরও উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুয়া (হুগলী জেলা) রেলস্টেশনের নিকটে (কলবাজার নামক স্থানে) 'যিশু আশ্রম' নামক একটি ঘেরা স্থানে দরিদ্রদের যে উপায়ে অমানবিক ভাবে অহিন্দু করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তা অন্যায়। এসব দেখেও কি হিন্দুরা জেগে উঠবে না? যে দেশমাতৃকা, যে ধর্ম, যে সংস্কৃতি আমাদের সর্বদা রক্ষা করে চলেছে, বাঁচার রসদ জোগাচ্ছে তাঁর সাময়িক দুর্দিনে আমরা কি তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসব না? শুধু তাই নয়, মণ্ডলাই গ্রামের যে স্থানটিতে বিপুল অর্থ সহযোগে 'হোলি ক্রস স্কুল'টি তৈরি করা হয়েছে সেটি আদতে একটি পুকুর বুজিয়ে ন্যায্য মূল্যের কয়েকগুণ দাম দিয়ে ক্রয় করে তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় তথা রাজ্য প্রশাসনের উচিত অনেক বেশি পরিমাণে সচেতন হয়ে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যায়কে প্রতিরোধ করা। কিন্তু সহজ বাস্তবটি হলো, বর্তমান প্রশাসন সংখ্যালঘু তোষণে বদ্ধপরিকর এবং জোটের রাজনীতিতে অতিমাত্রায় লালায়িত। ফলে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই 'যিশু আশ্রম'-এর প্রতিনিধিরা তাদের নোংরা কাজ পরিচালনা করছেন সহজে, সুষ্ঠুভাবে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে তিলে তিলে শেষ করে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার যে কপট আচরণ ভারতে বসবাসকারী অন্য ধর্মের অসহিষ্ণু নেতারা করছেন এবং উদ্দেশ্যগুলিকে সিদ্ধ করতে চাইছেন, তা ভারতহিতৈষীদের কোনোভাবেই মুখ বুজে মেনে নেওয়া উচিত নয়।

—অরিন্দম সাঁতরা,
আমরা, পাণ্ডুয়া, হুগলী।

পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ : একটি প্রস্তাব

পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের তৈরি নিত্যদিনের ব্যবহার্য সামগ্রী, প্রসাধনী, শুকনো ও প্যাকেটজাত খাদ্য এবং ওষুধ ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই বিষয়ে এই পত্রলেখকের একটা বিনীত প্রস্তাব আছে। পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ কর্তৃপক্ষ অন্তর্জাল ব্যবস্থাভিত্তিক বাণিজ্য গড়ে তুলুন। ভারতবর্ষে বহু সংস্থা (বিশেষ করে বিদেশি) অধিক মূল্যের ও কম গুণমান সমৃদ্ধ দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে অন্তর্জাল ভিত্তিক ব্যবসা গড়ে তুলেছে এবং উত্তরোত্তর তাদের ব্যবসার পরিধিও বাড়ছে।

পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ যদি অন্তর্জাল ভিত্তিক ব্যবসা গড়ে তোলে তাহলে নিম্নলিখিত সুফল মিলতে পারে—

(১) স্বদেশে তৈরি উত্তম, প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন ও নির্ভেজাল দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারে বিপ্লব আসতে পারে।

(২) প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান কার্যকরী ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

(৩) যোগ অনুশীলন ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হতে পারে।

(৪) বিজ্ঞাপন জগতের অস্বাস্থ্যকর ও হিংস্র থাবা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র মুক্তি পেতে পারে।

(৫) ভেষজ উদ্ভিদের চাষ বৃদ্ধির ফলে ঊষর মরুভূমিও শ্যামল সবুজ হতে পারে। যার ফলে বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো ভয়াবহ সমস্যার হাত থেকে বাঁচার সুযোগ মিলতে পারে।

(৬) সর্বোপরি অন্তর্জাল ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্ব যোগদিবসের (২১ জুন) দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ সংস্থা অন্তর্জাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণিজ্য, সেবা ও সংস্কারের পথে আরও গতির সৃষ্টি করুক।

—রোমিল আচার্য,
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

মক্কা ও মদিনায় গোহত্যা নিষিদ্ধ?

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের আহ্বায়ক ইন্দ্রেশকুমার নাগপুরে এক সমাবেশে বলেছেন— কোরানে গোরুকে উপকারী প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে...। মক্কা ও মদিনায় গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (স্বস্তিকা, ২৫.৪.১৬, পৃ. ৯)।

ইন্দ্রেশকুমারের কথা দুটি ঠিক নয়। এমন কোনো কথা কোরানে নেই। বরং সেখানে বলা হয়েছে— '...যেসব জন্তুর কথা তোমাদের বলা হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ আন্‌আম তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো...। (সুরা মায়েদাহ্, আয়াত নং ১)। মওলানা মোবারক করিম জওহর তাঁর অনূদিত 'কোরআন শরীফ'-এ বলেছেন— 'উট, গোরু, মেষ, ছাগল, হরিণ, নীলগাই, মোষ ইত্যাদি আন্‌আম-এর অন্তর্ভুক্ত; ঘোড়া, গাধা ও হিংস্র জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।'

মক্কায় গোহত্যা, তথা কোরবানি নিষিদ্ধ নয়; আব্দুল আজিজ আল আমান-এর 'কাবার পথে' গ্রন্থে হজে গো-কোরবানির উল্লেখ আছে—

(দ্র: 'ইসলামী ধর্মতত্ত্ব'— ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী)।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

পরম্পরা

কুম্ভমেলায় ভারতদর্শন

অমলেশ মিশ্র

বাংলা ১৪২৩-এর ৯ বৈশাখ, শুক্রবার, পূর্ণিমা তিথি (ইং ২২ এপ্রিল, ২০১৬) থেকে ৭ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা তিথি (ইং ২১ মে, ২০১৬) পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী নগরে শিপ্রানদীতে এক মাস ব্যাপী কুম্ভস্নান ও কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হলো। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। মহাকাল মন্দির ও তাল-বেতালের কাহিনি একে ঘিরেই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে একটি কাননঘেরা বাড়ি তিনি চেয়ে নিতেন রাজার কাছ থেকে তার স্তুতি গেয়ে, যদি তিনি কালিদাসের কালে জন্ম নিতেন। কবি কালিদাস ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভাও এই উজ্জয়িনীতে।

এই একমাসের মেলার জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকার মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহ্বানের নেতৃত্বে চার বছর আগে কাজ আরম্ভ করেছিল। বিশাল চওড়া নতুন নতুন রাস্তা, উড়ালপুল, জল নিকাশি পুল প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। শিপ্রানদী ক্ষীণ হওয়ার কারণে স্নানের অসুবিধা হতে পারে মনে করে পাশ্ববর্তী উচ্ছল নদী নর্মদা থেকে বিশাল বিশাল মোটা পাইপের সাহায্যে জল এনে ভরানো হয়েছে শিপ্রাকে। মাসাধিককাল ধরে ৮ কোটি মানুষের ভিড় সামলাতে যাবতীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একমাস ব্যাপী এই জনসমুদ্রকে এত পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি, সর্বদাই সর্বত্র পরিচ্ছন্ন ছিল। ঝাঁটা হাতে সাফাইকর্মী ২-৩ ঘণ্টা অন্তর সর্বত্র পরিচ্ছন্ন রাখত। মেলা শেষের পরের দিন ২২.৫.১৬ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং নিজে সাফাইকর্মীদের সঙ্গে থেকেছেন। এত বিশাল একটা এলাকা— যা কয়েক বর্গমাইল, যেখানে ২৪ ঘণ্টাই জনসমুদ্র, তাকে পরিচ্ছন্ন রাখা, সেই জনতাকে যাতায়াতে নিয়ন্ত্রণ রাখা, তাদের শৌচাগার, পানীয় জল এবং স্নানঘাটের পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা করার প্রয়াস প্রমাণ করেছে যে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং কেবলমাত্র দক্ষ নয়, বিচক্ষণ প্রশাসক। সুশৃঙ্খল এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করা যায় না। আমরা যারা ১ দিনের গঙ্গাসাগর মেলা দেখেছি— ভাবতে পারব না যে মাসাধিককাল ধরে এত বিশাল জনসমুদ্রের জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা করা যায়। সেই কয়েক বর্গমাইল এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর কোনো কাট-আউট বা ফ্লেক্স বিজ্ঞাপন দেখা যায়নি।

ভারতবর্ষের চারটি স্থানে বারো বছর অন্তর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে। হরিদ্বার, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), নাসিক ও উজ্জয়িনী। হরিদ্বারে গঙ্গা, প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনা অদৃশ্য সরস্বতী, নাসিকে গোদাবরী এবং উজ্জয়িনীতে শিপ্রানদী।

১২ বছর অন্তর এই কুম্ভযোগ নির্ভর করে সূর্য ও বৃহস্পতির অবস্থানের উপর। যেমন, হরিদ্বারে কুম্ভ হবে যখন সূর্য অবস্থান করবে মেষ রাশিতে ও বৃহস্পতির অবস্থান হবে কুম্ভরাশিতে। প্রয়াগে কুম্ভ হবে যখন সূর্য মকরে এবং বৃহস্পতি বৃষ রাশিতে। নাসিকে কুম্ভ হবে যখন সূর্য থাকবে কর্কট রাশিতে ও বৃহস্পতি বৃশ্চিকে (?), উজ্জয়িনীতে কুম্ভ হবে যখন সূর্য থাকবে তুলায় এবং বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে। এই অবস্থান পৃথিবীর সময়ের হিসাবে ১২ বছর অন্তর ঘটে থাকে।

পৌরাণিক কাহিনি হলো--- সমুদ্র মন্থনকালে যখন অমৃতকুম্ভ উত্তোলিত হলো তখন দেবতারা অসুরদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অমৃতকুম্ভ নিয়ে পলায়ন করে। পলায়নকালে চারটি স্থানে ওই অমৃতকুম্ভ পৃথ্বী স্পর্শ করেছিল। অর্থাৎ কুম্ভকে ভূমিতে রাখা হয়েছিল। ওই চারটি স্থানে কুম্ভ থেকে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হয়েছিল। অমৃতকুম্ভ ভূমি স্পর্শ করেছিল— হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনীতে।

বিশ্বাস এই যে, কুম্ভস্নান করলে যাবতীয় পাপ মোচন হয় এবং অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। ইতিহাস বইতে উল্লিখিত হয়েছে যে সম্রাট হর্ষবর্ধন ১২ বছরের উদ্বৃত্ত রাজস্ব এই কুম্ভমেলায় দান করতেন।

কুম্ভ স্নানে সমাগত কোটি কোটি মানুষকে একমাস ধরে নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য সরকার। শুধু নদীর ঘাটে ও তটে পুণ্যস্নানের ব্যবস্থা নয়,

পানীয় জল, শৌচাগার ও মেলা— সর্বত্র ব্যাপক ব্যবস্থা রাখা হয়।

এবারের উজ্জয়িনে তাপমাত্রা ছিল ৪৪-৪৫ ডিগ্রি। ট্যাংকে রাখা পানীয় জল চায়ের জলের মতো গরম। অথচ ১০০-২০০ মিটার অন্তর পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল— শীতল জল। ট্যাংকের জলকে পাইপের মাধ্যমে বিশাল বিশাল মাটির জালায় সঞ্চয় করে, সেই মাটির জালাকে ভেজা কাপড় দিয়ে মুড়ে, তাতে ট্যাপ লাগানো হয়েছে।

উত্তরপূর্ব ভারতের ধর্মান্তরিত খৃষ্টান প্রধান রাজ্যগুলি থেকে অল্প সংখ্যক মানুষ আসেন। কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ কুম্ভস্নানে আসেন, জনসমুদ্র তৈরি হয়, ২৪ ঘণ্টা পথ কল্লোলিত থাকে। ভারতবর্ষের পূর্ণ দর্শন পাওয়া যায় কুম্ভে। পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে জাতীয়তাবাদ (Nationalism)-এর ধারণা অর্বাচীন— বয়স ৮০০-১০০০ বছর। প্রাচ্যের ভারতের জাতীয়তাবোধের ধারণা বহু প্রাচীন। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবোধ রাজনীতি ভিত্তিক। ভারতের জাতীয়তাবোধ সংস্কৃতি ভিত্তিক। এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের পূর্ণ দর্শন পাওয়া যায় কুম্ভে।

সেই সঙ্গে আরও একটি গুরুতর প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, গ্রীস, রোম, মেসোপটেমিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি খৃষ্টান ও ইসলাম আক্রমণে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। সে দেশগুলির জীবনধারা ও জীবনচর্যায় তাদের সেই প্রাচীন সংস্কৃতির লেশমাত্র চিহ্ন নেই। অথচ গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের আক্রমণ ২২০০ বছর ধরে (খৃ.পূ. ৩২৬ থেকে ১৯৪৭ খৃ.) প্রতিহত ও মোকাবিলা করে ভারতবর্ষ তার সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারল কী করে? ভারতীয়দের জীবনধারায় ও জীবনচর্যায় এখনও সেই হাজার হাজার বছরের পুরানো সংস্কৃতি টিকে থাকল কী করে? ভারতবর্ষ যতবার এবং যতবছর ধরে আক্রান্ত হয়েছে, এতবার অন্য কোনোও দেশ তো আক্রান্ত হয়নি— তাও এতগুলি শক্তির দ্বারা।

যে ভারতীয় জনতা ২২০০ বছর ধরে বিভিন্ন শক্তির বর্বর ও ঘৃণ্য আক্রমণ থেকে এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে— সেই ভারতীয়দের সাক্ষাৎ মেলে কুম্ভমেলায়, কুম্ভ স্নানে। সেই ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ করা যায়, প্রণাম করা যায় কুম্ভ মেলায়।

আমরা কিছু ইন্ডিয়ান, কতভাবেই, কত ভাষাতেই এই ভারতীয়দের এই ধর্ম-সংস্কৃতির কতই না অপব্যাখ্যা ও অপযশ করি। অথচ ভাবি না যে এই ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষায় আমাদের অবদান কতটুকু বা আদৌ আছে কি না। আমরা অনেক ইন্ডিয়ানই এর নিন্দায় ও বিনাশে তীব্র প্রয়াসও চালাচ্ছি— আমাদের রাজনীতির নেতাদের মাধ্যমে, তথাকথিত শিক্ষাব্রতী তথা শিক্ষককুলের মাধ্যমে, সংবাদসেবার মাধ্যমে।

কুম্ভস্নান ও মেলা কত হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল— তার সাল তারিখ পাওয়া যায় না। তবে যত হাজার বছর আগে শুরু হোক না— তা এখনও বহমান— প্রবল বিক্রমে বহমান। সেই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ভারতীয়ের জনস্রোত আজও প্রবহমাণ।

সেই ভারতীয় জনতা যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্ব ভরে বলছে— কী তোরা হাজার বছরের পুরনো রাজনৈতিক জাতীয়তা নিয়ে এত লড়াই ঝগড়া করিস? এই দ্যাখ, আমরা আমাদের কয়েক হাজার বছরের পুরনো সাংস্কৃতিক জাতীয়তা নিয়ে কেমন ভিড় ঠেলে পায়ে পায়ে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছি মহালগ্নে পুণ্যস্নান করতে। আর তোরা তো ঘরে বসে আছিস আর আমাদের বলছিস— এরা কী বোকা! এরা কী সংস্কারাচ্ছন্ন। একথা জানবি যে আমাদের মতো বোকারাই ২২০০ বছর ধরে গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরেজদের অতি ঘৃণ্য বর্বর আক্রমণ থেকে এই সুন্দর ভারতবর্ষকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। তোরা তো অনেকেই ভয়ে এবং লোভে জাত খুইয়ে কাঙাল হয়ে গেছিস, অনেকে আবার ইন্ডিয়ান হয়ে দেশের শ্রাদ্ধ করছিস! কিন্তু আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা হিন্দু।

আমাদের জাতীয়তা— হিন্দু জাতীয়তা। আর তোরা এই হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাকে বলিস, হিন্দু মৌলবাদ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। কবে বুঝতে শিখবি এই দেশটাকে। গাছটা আছে বলেই তো ফলটা খাচ্ছিস। গাছটা বাঁচিয়ে রেখেছি আমরা। তোরা জানিস না— গাছটা মরে গেলে তোরা আর তার ফলটা পাবি না।

আমি সব কুম্ভমেলাতেই যাই বিনা কষ্টে যাতায়াত ও থাকার সুযোগ নিতে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করি। পুণ্যলগ্নে পুণ্যস্নান আমার হয় না। আমি এই পুণ্যস্নানে কোনো আগ্রহও দেখাই না। আমার কোনো খেদ বা আক্ষেপও নেই। যে-কোনো সময়ে ওই নদীর যে কোনো অংশে একবার ডুব দিতে পারলেই আমি খুশি। তবু আমি প্রতি কুম্ভে যাই। আমি যাই সেই কোটি কোটি ভারতীয়দের দর্শন করতে, প্রণাম করতে। তাদের কারুরই মুখ আমি চিনি না কিন্তু তাদের সমষ্টির মূল আমার খুবই পরিচিত। আমি তাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা জানাই। এই ভারতীয়দের ত্যাগের কারণেই আজ আমি গর্ব করে বলতে পারি— আমি একজন ভারতীয়। বিবেকানন্দের অনুজ্ঞার মতো গর্ব ভরে বলতে পারি আমি একজন হিন্দু। হিন্দু জাতীয়তা আর ভারতীয় জাতীয়তা অভিন্ন আর সেই জাতীয়তার সঠিক নাম— সাংস্কৃতিক জাতীয়তা। এর মূল্য এবং গুরুত্ব রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের থেকে বহু বহুগুণ বেশি।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি— এ আশা ত্যাগ করিবার নহে। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।'

আশা আমরা ত্যাগ করব না। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো— রাজনৈতিক জাতীয়তার ভিত্তি হলো— রাষ্ট্রীয় স্বার্থ— যা দ্বন্দ্ব, দ্বেষ-বিদ্বেষ, যুদ্ধ ও সংগ্রাম আহ্বান করে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তা সমন্বয়ের ও ঐক্যের সাধনা করে। হাতের ৫টি আঙ্গুল একান্ত অসম হয়েও যেমন সমন্বিত, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাও তাই।

গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-শিপ্রা নদীতটে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলাগুলিতে সমবেত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ভারতীয়দের শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানালেই, তাদের নির্লোভ অকৃত্রিম ত্যাগের কথা স্মরণ করলেই হৃদয়ে এক অনভূতি আসে— যা ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। আমাদের শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানগুলির হাজার হাজার শিক্ষকবৃন্দ, পাঠাগারগুলির লক্ষ লক্ষ পুস্তকসমূহ এই ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জ্ঞান ও অনুভূতি দিতে ব্যর্থ।

জ্ঞানতাপস মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

রূপশ্রী দত্ত

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭— ১২ জুন, ১৯৭৬) সংস্কৃত ও তন্ত্রশাস্ত্রে এক অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ও দার্শনিকও ছিলেন।

পিতা বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুর পর গোপীনাথের জন্ম। অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ধামরাই অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এরপর কে এল জুবলি হাই স্কুলে ভর্তি হন। গোপীনাথের বংশগত পদবি বাগচী। কবিরাজ তাঁর সাম্মানিক উপাধি। তিনি জয়পুরের মহারাজা কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৪ সালে এমএ ডিগ্রি পান। এখানে তিনি সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন মধুসূদন ওঝা, শশধর তর্কচূড়ামণির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।

এরপর তিনি কর্মজগতে প্রবেশ করেন। বারাণসীর সরস্বতী ভবন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হন এবং বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তন্ত্র ও তান্ত্রিক দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

এরপর তিনি বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস যোগীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগবিদ্যা আয়ত্ত করেন।

গোপীনাথ বিবাহ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের এক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পরিবারের কন্যা কুসুমকুমারী দেবীকে। তাঁদের দুই সন্তান— পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ও কন্যা সুধা।

'সরস্বতী ভাবনা গ্রন্থমালা'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। গোপীনাথ ১৯৬৪-তে সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পান এবং সে বছরেই পান পদ্মবিভূষণ। ১৯৭১ সালে সাহিত্য আকাডেমি ফেলোশিপ পান। এটি সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান।

১৯৩৭ সালে তিনি কর্মজগৎ থেকে অবসর নেন। গুরু বিশুদ্ধানন্দের মৃত্যুর পর তিনি যোগসাধনা ও তন্ত্র-গবেষণায় লিপ্ত হন। কাশ্মীরে শৈবধর্ম বিষয়েও তিনি গবেষণা করেন। সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ১৯৩৪ সালে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। শেষজীবনে তিনি মা আনন্দময়ীর সংস্পর্শে আসেন। মাতৃবিষয়ক নানা পুস্তকে গভীর আধ্যাত্মিক দর্শন বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ধ্যান, তপস্যা, তন্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। মা আনন্দময়ীর বারাণসীস্থিত ভদৈনী অঞ্চলের আশ্রমে তিনি শেষজীবনে বাস করতেন। ১২ জুন, ১৯৭৩-এ তিনি লোকান্তরিত হন। ধর্মের বহুমুখী প্রকাশের আকর স্বরূপ ছিলেন গোপীনাথ। মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে তিনি কিংবদন্তীর মর্যাদা লাভ করেছেন। ■

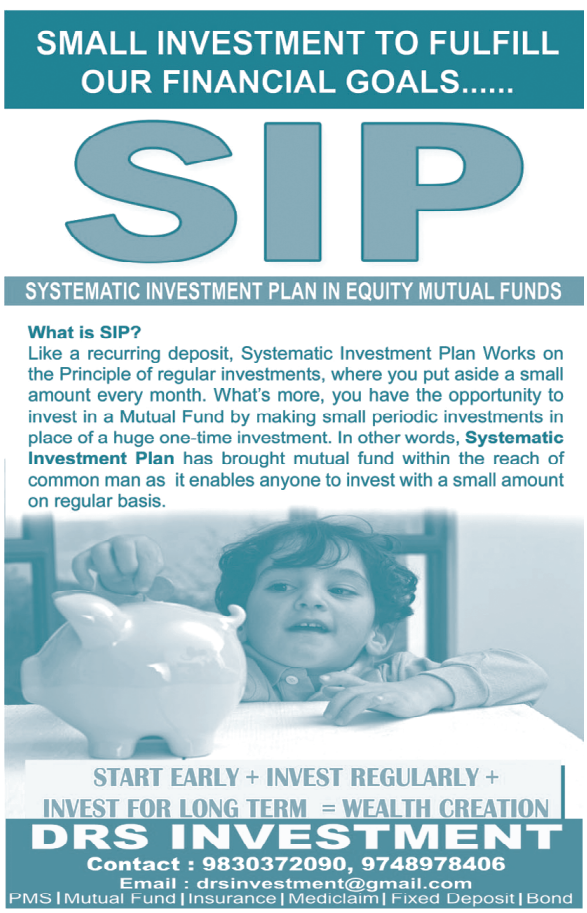

কাঁঠাল চুক্তি

মাঝরাতে ডাবলুর ঘুম ভেঙে গেল। পেটের ভিতর কী যেন ধাক্কাধাক্কি করছে। হুড়মুড় করে সে বিছানা ছেড়ে উঠলো। মনে পড়লো বিকেলবেলার ঘটনার কথা।

আজ বিকেলে ফুটবল মাঠে বেড়াতে গিয়ে ডাবলুর খুব কাঁঠাল খেতে ইচ্ছে করছিল। সঙ্গে ছিল ওর বন্ধু পল্টু। সে পল্টুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল— চল পল্টু, দুজনে কাঁঠাল খাই। দুজন মিলে পয়সা দিয়ে কিনবো। যে বেশি কাঁঠাল খাবে সে বেশি পয়সা দেবে।

শুনে পল্টু খুব খুশি। তারা দুজনে মিলে বাজারে গেল। আগে খাওয়া তারপর পয়সা। কাঁঠালওয়ালার সঙ্গে সেইমত চুক্তি হলো। তারপর কাঁঠাল কিনে দুই বন্ধু বসে খেতে লাগলো।

ডাবলুকে গুরু মানলেও পল্টু খুব হুঁশিয়ার ছেলে। খাচ্ছে আর গুনছে, কে কত কাঁঠাল খেল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তারা দুই বন্ধু এক সঙ্গে খেলেও ডাবলুর কাঁঠাল বীচির সংখ্যা কম কী করে? পল্টুর সাত ডাবলুর চার, পল্টুর পনেরো ডাবলুর এগারো। শেষে দেখা গেল পল্টুর কাঁঠাল বীচির সংখ্যা অনেক বেশি। তাই তাকে বেশি দাম চোকাতে হলো।

এটা হলো কী করে? সেই কথা মনে পড়তেই ডাবলুর পেটের

মোচড়টা আরো বেড়ে গেল। আসল ঘটনা হলো বেশি দাম চোকানোর ভয়ে ডাবলু কালকে বীচি শুদ্ধ কাঁঠাল খেয়ে ফেলেছিল। সেই বীচিগুলি এখন পেটের ভিতর দৌড়ঝাঁপ করছে।

বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। এত রাতে এখন সে কী করে! মা বাবা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ডাকলে শুনতে পাবে না।

তখন সে দৌড়ে গিয়ে উঠোনের দিকে পিছন করে বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পেট খালি করে সব কাঁঠাল বীচি বেরিয়ে গেল। পিছন ফিরে দেখলো বৃষ্টিতে ধুয়ে কাঁঠালবীচিগুলি ঝকঝক করছে।

পরের দিন সকালে মা উঠোন ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখে বারান্দার নীচে কতগুলি কাঁঠাল বীচি পড়ে আছে। ডাবলুর বাবা হয়তো কাল বাজার থেকে এনেছে!

মায়ের ডাকে ডাবলুর ঘুম ভেঙে গেল। মা বলল— উঠোনে কাঁঠাল বীচি আছে, ধুয়ে নিয়ে আয়। কাঁঠালবীচি সেদ্ধ আর ভাত খেয়ে স্কুলে যাবি।

শুনে আঁতকে উঠলো ডাবলু। কাঁঠাল বীচি সেদ্ধ!

ভালো করে সব তুলে নিয়ে সে পুকুরে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো— এখন সে কী করে! দেরি হচ্ছে দেখে মা ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিয়েছে। কোনো উপায় না পেয়ে ডাবলু বীচিগুলো ব্যাগে ভরে মাঠের দিকে দৌড় লাগালো। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না।

ফাজিল মামা

রাজ্য পরিচিতি

ঝাড়খণ্ড

বিহার রাজ্যের দক্ষিণভাগে বনাঞ্চল ক্ষেত্রের ১৮টি জেলা নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে ২০০০ সালের ১৮ নভেম্বর। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই রাজ্যের বীর সন্তানদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বন সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্য খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন এই রাজ্যের যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়। আয়তন ৭৯ হাজার ৭১৪ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৩৮ জন। রাজধানী রাঁচী। জামসেদপুর শহর টাটা স্টিল কারখানার জন্য বিখ্যাত। বোকারো, চাইবাসা, দেওঘর, হাজারিবাগ, দুমকা, গুমলা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শহর। উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করেছিলেন বনবাসী নেতা বিরসা মুণ্ডা। তিলকা মাঝি বনবাসী সাঁওতালদের সংগঠিত করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন।

প্রশ্নবাণ

১. ‘কোহিনুর’ ভারতে সর্বশেষ কার কাছে ছিল?
২. পেলের পুরো নাম কী?
৩. দক্ষিণা গঙ্গা কোন্ নদীকে বলা হয়?
৪. কোন বাঙালি মহিলা সাহিত্যিক ‘জ্ঞানপীঠ’ পুরস্কার পেয়েছেন?
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ কে ছিলেন?

উত্তর : ১. নাদির শাহ। ২. এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো। ৩. গোদাবরী। ৪. আশাপূর্ণা দেবী। ৫. দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ছবিতে অমিল খোঁজ

ছোটদের কলমে

রুমির চিঠি

রূপসা দেবনাথ, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা

কতদিন তোমায় দেখি না মা
নেই তার ঠিক
স্কুলেতে যেতে হবে
ঘড়ির কাটা করছে টিকটিক।
ডলপুতুল আর ঝুমঝুমি
কাল কিনেছি মেলায় গিয়ে

জানো মাগো ফেরার সময়
তা ভাঙলো পড়ে গিয়ে।
এবার যখন আসবে তুমি
খেলনা এনো ব্যাগ ভরে
ঝুমঝুমি তাতে থাকলে আমি
নাচব দু-হাত তুলে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

কন্যাভ্রূণ হত্যা এক দীর্ঘমেয়াদি অভিশাপ

রিনি রায়

বংশরক্ষার জন্য একটি পুত্রসন্তান কম-বেশি সব পরিবারেই কাম্য। যদিও বর্তমানে এই ধ্যানধারণার কিছুটা বদল ঘটেছে। অনেক পরিবারে এককভাবে একটি কন্যাসন্তানকে সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা দিয়েই অতি যত্নে লালন-পালন করা হয়। তবুও প্যাথোলজিক্যাল সেন্টারগুলোতে এখনও চোখে পড়ে 'এখানে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ হয় না। লিঙ্গ নির্ধারণ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।' তবে কি এ বিজ্ঞপ্তি অন্য কথা বলে? বোধহয় তাই। পরপর কন্যা সন্তান জন্মানোর দায়ে স্ত্রী-কে হত্যা করা, বাড়িছাড়া করার ঘটনা নতুন কিছু নয়। গত বছরই শেষের দিকের একটি ঘটনা 'সভ্য' প্রাণী নামে জাহির করা আমাদের মুখ লজ্জায় ঢেকে দেয়। পরপর চারটি কন্যা সন্তান জন্মানোর পর চতুর্থ সদ্যোজাত কন্যাটিকে নিজের বাড়ির উঠোনে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। আমাদের দেশে আইন থাকা সত্ত্বেও কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে। কেবলমাত্র বংশরক্ষার মোহে পড়ে কন্যাভ্রূণ-সহ মায়ের উপরেও নেমে আসছে অত্যাচারের খাঁড়া। সেইক্ষেত্রে নারীর এই দুই রূপের ওপর অত্যাচার মানব সমাজ তথা মানব সভ্যতার এক বড় সঙ্কটময় দিক। কারণ নারী ছাড়া সমাজ! সে তো ধ্বংসেরই সামিল। ২০০১ এবং ২০১১-র আদমশুমারির দিকে যদি চোখ রাখা যায় তবে দেখা যাবে আগে যেখানে যথাক্রমে ছয় বছরের নীচে প্রতি এক হাজার বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল ৯২৭, এবারের জনগণনায় সেই সংখ্যার অবনমন ঘটে দাঁড়িয়েছে ৯১৪-তে। পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো উত্তরভারতের কিছু রাজ্যে এই সংখ্যাটা সাড়ে আটশোরও কম। একমাত্র হিমাচলপ্রদেশ বাদ দিলে দিল্লী, জম্মু-কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান-সহ গোটা উত্তর-পশ্চিম

ভারতেই পুত্রসন্তানের তুলনায় কন্যাসন্তানের সংখ্যা কম। যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যার এই অবনমন চক্রাকারে বৃদ্ধি করছে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধসমূহকে। পাঞ্জাব-হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলিতে ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য মেয়ে পাওয়া যায় না। ফলত ভিন্ রাজ্য থেকে মেয়ে এনে এখানে বিয়ে দেওয়ার চল আছে। এর ফলে বাংলার ও উত্তর-পূর্বের পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের একাংশের ঠাঁই হয়েছে উত্তরের রাজ্যগুলির কোনো গৃহস্থের ঘরে। তাই বলে মনের মধ্যে এই ভাবনাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না যে বিয়ের পর তারা ভালো থাকে, সুখে থাকে। জর্জ বার্নার্ড শ'-র সূত্র ধরে বলতেই হয় যে বিয়ে সেখানে একটা 'লিগাল প্রস্টিটিউশন'-এর মতোই। কাঙ্ক্ষিত সন্তান ধারণের কাজ মিটে গেলে আবার তাদের হাত বদল হয়। কয়েকবছর মেয়েটি যার সঙ্গে ঘর করলো, যাকে স্বামী বলে মেনে নিলো, সেই-ই আবার তাকে বিক্রি করে দিল অন্য কারোও কাছে। পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের বয়স, সৌন্দর্য, গায়ের রঙ, সতিত্বের বিচারের এক একজনের দর সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে। কন্যাভ্রূণ হত্যা তাই পক্ষান্তরে সমাজের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি কুফল বহন করে চলেছে।

আমরা দুর্গার পূজা করি, কালীর পূজা করি, লক্ষ্মী, সরস্বতী— যে রূপকেই আমরা পূজা করি না কেন, তা এক নারীমূর্তির। আমাদের সমাজ, ধর্ম সব কিছুই অতি প্রাচীনকাল থেকে নারীকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে কিন্তু কালের ক্রমবিবর্তনের এমনই পরিহাস যে নারী আজ তার দেবিত্বের মর্যাদা হারিয়েছে। পণ্যের মতোই নারীকে আজ মনে করা হচ্ছে। কন্যার জন্মের মুহূর্ত থেকেই লাভ-ক্ষতির হিসাব শুরু হয়ে যায়। তাই আজ কন্যা সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে, তার বেঁচে থাকাকে নিশ্চিত করে তুলতে সচেতনতার প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের চতুর্থ রবিবার বা ২৬ সেপ্টেম্বর ঘটা করে পালন করা হচ্ছে 'জাতীয় কন্যাসন্তান দিবস'। তাদের শিক্ষাদানকে সুনিশ্চিত করতে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে নেওয়া হচ্ছে একাধিক সরকারি প্রকল্প। এর মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' উল্লেখযোগ্য। তবুও এত প্রচার, প্রচেষ্টার পরেও সামগ্রিকভাবে উত্তরের রাজ্যগুলিতে মেয়েরা ভালো নেই। এখনও উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রামে গ্রামে ঘুরলে অনুভব করা যাবে কোনো ভিন রাজ্যের বধূর ফোঁপানো কান্নার শব্দ অথবা প্রত্যক্ষ করা যাবে বালিকা বয়সের স্বতঃস্ফূর্ততা বিসর্জন দিয়ে ঘোমটা টানা কোনও এক ছোট্ট বধূর।

অনন্তনাগ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন

ভূস্বর্গে একপ্রকার গণভোট

অতিথি কলম

দিলীপ পড়গাঁওকর

ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সইদের মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীরে পিডিপি-বিজেপি জোটের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মুফতি কন্যা মেহবুবা। মেহবুবা মুফতি মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের আগে রাজ্যের অন্যতম সাংসদ ছিলেন। পরিষদীয় নিয়ম অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের ছ' মাসের মধ্যে তাঁকে রাজ্যের কোনো বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। তাই, তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অতি গুরুত্বপূর্ণ এই অনন্তনাগ বিধানসভা আসনটিকে তিনি বেছে নিয়েছেন। অতীতে এই আসনে ২০০৯ ও ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে এসেছিলেন মুফতি মহম্মদ সইদ। সেই নিরিখে এক কথায় হয়তো আসনটিকে পিডিপি-র পক্ষে নিরাপদই বলা যায়। কিন্তু বাস্তব ঠিক সেরকম নয়। সে সময়ের পটভূমি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ২০০৯-এর কথা বাদ দিলেও ২০১৪ সালের নির্বাচনী লড়াইয়ের সময় মুফতির দলের

> অতীতের নির্বাচনের সময় পিডিপির প্রার্থী কোনো জোট সরকারের প্রধান হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। বিজেপি দলের জোটসঙ্গী হয়ে নির্বাচন লড়া তো অকল্পনীয় ছিল। তাই এই নবীন জোটকে উপত্যকার মুসলমানরা কোন মানদণ্ডে বিচার করেছে তারই প্রথম পরীক্ষা এই উপনির্বাচন।

তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির সঙ্গে কোনো জোট সরকার ছিল না। তাই ছিল না নির্বাচকদের কাছে এই জোটের তাৎপর্য ব্যাখ্যার কোনো আলাদা প্রয়োজন। আজকে মুফতির মৃত্যু- পরবর্তী শূন্য আসনে লড়তে নেমে শুধু মাত্র পিডিপি দলের সভানেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়াও উপত্যকা ও মূলত জম্মুতে কেন্দ্রের প্রভাবশালী শাসকদল বিজেপির সঙ্গে জোট সরকারের কর্ণধার হিসেবেও তাঁর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। তাই গত ২২ জুনের উপনির্বাচনটি দীর্ঘদিন বিক্ষোভতাড়িত উপত্যকায় প্রায় গণভোটের মাত্রা পেয়েছে।

তাই, নির্বাচনটি সরলার্থে কেবলমাত্র রুটি-মাখনের বখরা নিয়ে লড়াই নয়। এই নির্বাচনে পরীক্ষার মুখে পড়তে চলা পিডিপি- বিজেপির জোট সরকারকে উপত্যকার মুসলমানরা কী চোখে দেখছে? অতীতের নির্বাচনের সময় পিডিপির প্রার্থী কোনো জোট সরকারের প্রধান হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। বিজেপি দলের জোটসঙ্গী হয়ে নির্বাচন লড়া তো অকল্পনীয় ছিল। তাই এই নবীন জোটকে উপত্যকার মুসলমানরা কোন মানদণ্ডে বিচার করেছে তারই প্রথম পরীক্ষা এই উপনির্বাচন।

এমন একটা উত্তেজক পরিস্থিতিতে শেষমেষ ন'জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী মেহবুবা যদি জয় ছিনিয়ে নেন, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে এটাই প্রমাণ হবে ও একটি সুদূরপ্রসারী সঙ্কেত যাবে বিজেপি দলকে এত যুগ ধরে কেবলমাত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দল— যারা চিরকাল জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত থাকাটা অবলুপ্ত করার পক্ষে সওয়াল করে এসেছে তাদের খাটো করে দেখাটা ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এই একঘরে করে রাখার মনোবৃত্তিকে ধিক্কার জানাবে মেহবুবার জয়। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো ফলাফল হলে উপত্যকায় আবার অবিশ্বাস ও অস্থিরতার বাতাবরণ বৃদ্ধি পাবে।

তাই বলছি, মেহবুবার জয়ের অভিঘাত হবে সুদূরপ্রসারী। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখোশ খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি মদতে যারা কাশ্মীরের স্বাধীনতার নামে এক উদ্ভট কল্পিত বস্তুর পেছনে ছুটে চলেছে সেই সন্ত্রাসবাদীরাও ফ্যাঁসাদে পড়বে। জম্মু ও কাশ্মীর এই দুটি পৃথক অঞ্চলের মধ্যে গড়ে উঠবে আরও বেশি সংহতির পরিবেশ। একই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সম্ভাবনা বাড়বে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির যা সহায়ক হবে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের। ঠিক সেই মাপকাঠিতেই ভোটদাতাদের কম অংশগ্রহণ অর্থাৎ ভোটদানের সংখ্যা কম হওয়া বা মেহবুবার পরাজয় নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাবাদী, জাতপাত ও আঞ্চলিক রাজনীতির কালো ছায়াকে আহ্বান করবে।

এদিকে অনন্তনাগের নির্বাচকদের

ফঃ ৪

মতিগতি বোঝা ভার। এক অর্থে কেন্দ্রটি কিন্তু পিডিপি'র গড়। আগেই বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর বাবা এখান থেকে ভাল ব্যবধানে দু'বার জিতেছিলেন। শেষ বিধানসভা অর্থাৎ ২০১৪ সালে মধ্যপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও কট্টরপন্থীরা উভয়েই সেবার নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয়। কিন্তু সারা জম্মু-কাশ্মীরেই ভোটাররা এই ডাকে সাড়া না দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল হয় ত্রিশঙ্কু। পিডিপি পায় ২৮টি আসন, বিজেপি পায় ২১টি আসন। বলে দিতে হবে না পিডিপি'র আসনগুলি যেমন মূলত ছিল মুসলমান অধ্যুষিত উপত্যকা কেন্দ্রিক, বিজেপির ছিল হিন্দু অধ্যুষিত জম্মু-কেন্দ্রিক। তাই দুটি দলেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যে নির্বাচনী রায় এসেছিল তাকে কোনোভাবেই হঠকারীভাবে হঠাৎ কোনো বাইরের কম সংখ্যার দলগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সিদ্ধান্ত নেয়নি। দীর্ঘ আলোচনা প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হয়েছে। সরকার গঠিত হওয়ার পর গত ৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মুফতি প্রয়াত হন। তাঁর কন্যা বরাবরই রাজনীতিতে আছেন। তিনি বাবার আসন গ্রহণের জন্য তৈরি হন। এই সময় পিডিপি দলের প্রবীণ কিছু নেতা মেহবুবাকে পুনরায় বোঝাতে থাকেন বিজেপির মতো তথাকথিত 'সাম্প্রদায়িক' দলের সঙ্গে জোট চালিয়ে গেলে দলের মূল জনাধার হারাবার সম্ভাবনা রয়েছে। পিডিপির এই মাতব্বরদের কথায় আরও ঘি পড়ে যখন উঠে আসে লাভ জিহাদ, ঘরওয়াপসী, গোমাংস ভক্ষণ ইত্যাদির মতো বিষয়।

বাস্তবে কিন্তু দেখা গেছে মেহবুবা এই উভয়দলের কথাতেই কান দেননি। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিরাগের পাহাড় জমছে। তাই মেহবুবার উইকেটটি খুবই চ্যালেঞ্জের। কট্টরবাদী হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শা গিলানি সরাসরি দোষারোপ করে বলেছেন মেহবুবা আর এস এস-এর হাতের পুতুল হয়ে কাজ করছেন। এর ফলে রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকেই জানেন রাজ্যের তরফে বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিত ও সৈনিকদের জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে। মেহবুবা কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে হরিয়তের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

শুধু তাই নয়, মেহবুবা বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের ঘাড় ধরে টেনেছেন। তিনি তাঁদের ইসলাম বিরোধী কাজ করার জন্য দায়ী করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে অরাজকতা ও রক্তপাতের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে তাঁর একেবারে সাম্প্রতিক দুটি তৎপরতা। গত ৩ জুন অনন্তনাগ জেলার বিজবেহরা অঞ্চলে ও ৪ তারিখের ওই অনন্তনাগই সন্ত্রাসবাদীদের উপর্যুপরি আক্রমণ দুটিকে পাকিস্তানি মদতে সংঘটিত বলে আখ্যা দেওয়া। সঙ্গে এও জানাতে দ্বিধা করেননি যে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতেই এই আক্রামণ চালানো হয়েছে।

কিন্তু কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি সেরকম আশাপ্রদ মোটেই নয়। বারবার সন্ত্রাসবাদী হামলায় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরও মৃত্যু হচ্ছে। মারা যাচ্ছেন নিরীহ নাগরিকরাও। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের অন্তিম সংস্কারের সময় বিপুল জনসমাগম দেখা যাচ্ছে। পাথর ছুঁড়ে আঘাত করার ঘটনাও বেড়েছে। ৩১ মার্চ শ্রীনগরের এন আই টি সংস্থায় ছাত্রদের দেশবিরোধী কার্যকলাপের পর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। সৈন্যবাহিনীর ওপর তরুণী বলাৎকারের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এগুলি সবই ভারত রাষ্ট্র বিরোধী জনতার আক্রোশ প্রসূত।

অন্যদিকে দেশের নিরাপত্তারক্ষা বাহিনী গোপন তদন্তের ভিত্তিতে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অত্যন্ত সফল অপারেশন চালিয়েছে। ফলস্বরূপ ঘোর সন্ত্রাসবাদী হিজবুল মুজাহিদ্দিনের ১৫ জন উচ্চপদাভিষিক্ত কমান্ডারদের মধ্যে ১০ জন নিহত হয়েছে। হিজবুলের কুখ্যাত কমান্ডার বুরহান ওয়ানির ঘনিষ্ঠ সহচর বলে পরিচিত তারিফ পণ্ডিত হালে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইতিমধ্যে জোট সরকারের তরফে বেশ কিছু সদর্থক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বড় পরিবর্তন আনতে কয়েকটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপও রয়েছে। তাই অনন্তনাগের নির্বাচনী ফলাফল একইসঙ্গে কাশ্মীরিদের মানসিকতার হালহকিকত প্রকাশ করার সঙ্গে তাদের ভারত ভাবনার ছবিও চূড়ান্ত ও সুস্পষ্টভাবে সামনে আনবে যা অন্য কোনো অতীত নির্বাচনে পাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই প্রতীক্ষার প্রহর শুরু।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে দু-এক কথা

প্রিয়ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ইংরিজি 'Religion' ও সংস্কৃত 'ধর্ম' আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একার্থ হলেও আসলে দুটি ভিন্ন শব্দ। 'ধৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'ধর্ম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ, যা ধারণ করতে পারে। হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলেও বোঝা যায়, এই ধর্ম অন্য অনেক মত ও পথের মতো শুধুমাত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ভর বা প্রচার-প্রসার নির্ভর হয়ে থাকেনি, বরং সবকিছুকে ধারণ করেছে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে কী ধারণ করার কথা বলা হচ্ছে? এর উত্তর, এককথায় সবই। প্রেম ভক্তি ত্যাগ বীরত্ব সংসার সমাজ রাষ্ট্র— সবই একজন হিন্দুর কাছে ধর্ম। হিন্দুধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রকেই মান্যতা দেয়। এই কারণে খৃষ্টান এবং ইসলামের তুলনায় হিন্দুধর্মের স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা দুটোই বেশি।

হিন্দুধর্মের মূলসূত্রটি হলো মানবিকতা। ধর্ম যদি মানবিক না হয় তাহলে তাতে জল ও হাওয়া কিছুই থাকে না, সেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না যা না থাকলে মানুষের ঠিকমতো বেড়ে ওঠাই মুশকিল। একটু অন্যভাবে দেখলে বোঝা যায়, মানবিকতা ছাড়া যেমন হিন্দুধর্মের কল্পনা করা সম্ভব নয় আবার হিন্দুধর্মকে বাদ দিয়ে মানবিকতাকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। স্বামীজীর অমর উক্তি— 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'— কথাটি একমাত্র হিন্দুধর্মের কোনো মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব। কারণ এখানে 'জীব' শুধু মানুষ নয়। হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকে ভালোবাসার কথা বলে। সৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করে। অন্যধর্মে সর্বব্যাপী এই মমত্ববোধ নেই।

বাইবেল বলছে খৃষ্টান হও। কোরান বলছে মুসলমান হও। অথচ হিন্দুধর্ম বলছে, একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠো। পার্থক্যটা সহজেই বোঝা যায়। এখন দেখা যাক প্রকৃত মানুষ বলতে ঠিক কী বলা হচ্ছে। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার মাৎসর্য ইত্যাদি ষড়রিপুকে জয় করতে পেরেছেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। অর্থাৎ জোরটা চরিত্রগঠনের ওপর। এ দেশে প্রকৃত মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ ভগবান শ্রীরাম। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজা, অবিসংবাদী নেতা। রিপুজয়ী একজন প্রকৃত মানুষ। হিন্দুধর্মের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। যে কোনো ব্যক্তি যদি ভগবান শ্রীরামের আদর্শে নিজেকে দীক্ষিত করতে পারেন তাহলে তিনিও সেরার সম্মান পান। এর থেকে আরও একটা জিনিস স্পষ্ট। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর কোনো বায়বীয় পদার্থ নন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি কথা প্রায়ই বলতেন, 'যত মত তত পথ।' কথাটির মধ্যে এক আশ্চর্য সহনশীলতা ও সহমর্মিতার ভাব রয়েছে। এটাও হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হিন্দুধর্ম একই সঙ্গে সহনশীল এবং সহানুভূতিশীল। ইসলামে অবিশ্বাসীদের 'কাফের' বলে যার অর্থ বিধর্মী বা অবিশ্বাসী। আবার খৃস্টানদের বিশ্বাস প্রতিটি মানুষই পাপী এবং মানবজনম হলো পাপস্খলনের মাধ্যম। বলাবাহুল্য, হিন্দুরা এসব মানে না। কাউকে কাফের বলার মদমত্ততা তাদের যেমন নেই, তেমনই নেই নিজেকে পাপী ভাবার হীনম্মন্যতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার তাঁর এক ব্রাহ্ম ভক্তকে এই বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সকলেই জানেন ব্রাহ্মরা ছিলেন মূলে হিন্দু কিন্তু আচার বিচারে খৃষ্টান। তাই ভক্তটি নিজেকে পাপী মনে করতেন। একদিন ঠাকুর বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মা থাকতে অত পাপী পাপী করো কেন! পাপপুণ্য বিচার করার তুমি কে? তোমার অহঙ্কার এখনও যায়নি দেখছি।'

সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুধর্মের যাত্রা। দীর্ঘপথে বাধাবিপত্তি কম আসেনি। হিন্দুদের বৌদ্ধিক চর্চা তাদের থামতে দেয়নি। হিন্দুধর্ম বরাবরই বুদ্ধি ও বৌদ্ধিক চর্চার ওপর জোর দেয়। কারণ বাধাবিপত্তি জয় করে মানসিক শান্তি বজায় রাখার জন্য বুদ্ধি জরুরি। সেই সঙ্গে জীবনের সবক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যেও বৌদ্ধিক চর্চার প্রয়োজন। কতকটা এই কারণেই হিন্দু জ্ঞানভাণ্ডার এমন অফুরান। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন কাব্য জ্যোতিষ সব ক্ষেত্রেই হিন্দুদের বর্ণময় উপস্থিতি।

ধর্ম যে সংস্কৃতির জন্ম দেয় তার থেকেই তৈরি হয় জাতীয়তাবোধ। ভারতবর্ষ নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতির

দেশ। কিন্তু ধর্মের নিগড়ে এক সূত্রে বাঁধা। তাই জাতীয়তাবোধ একই সঙ্গে ভারতীয় এবং হিন্দু। 'ভারতমাতা কী জয়' কিংবা 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী' ইত্যাদি এই জাতীয়তাবোধের মন্ত্র। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ তার কারণ এখানকার বেশিরভাগ মানুষ হিন্দু। এর অন্যথা হলে আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে না। হিন্দুরা বিশ্বাস করে জাতীয়তা তাদের জীবনের অঙ্গ।

জ্ঞানের পর ভক্তি। গীতায় বর্ণিত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের প্রত্যেকটিই হিন্দুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করে। হিন্দুদের ভক্তির স্বরূপটি ঠিক কেমন? ছোটবড়ো নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি জীবের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্তা হলেন ঈশ্বর। সকল জীব যন্ত্রবিশেষ আর ঈশ্বর তাদের যন্ত্রী। এই ধারণাই হিন্দুদের ভক্তির ভিত্তি। আবার সেই ভক্তি কখনোই একরকমের নয়। শ্রীভাগবত এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ভক্তি নয় রকমের। ১। দাস্য, ২। শ্রবণ, ৩। বন্দনা, ৪। স্মরণ, ৫। পদসেবা, ৬। স্নেহ, ৭। কীর্তন, ৮। আত্মনিবেদন, ৯। অর্চনা। কিন্তু হিন্দুদের ভক্তি কখনোই কেবলমাত্র ঈশ্বরোপসনায় সীমাবদ্ধ নয়। তার স্থান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ব্যাপ্তির প্রয়োজনেই সেই ভক্তি রূপান্তরিত হয়ে কখনো প্রীতির ভাব অবলম্বন করে, কখনো শ্রদ্ধার, কখনো স্নেহের। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সন্তানের প্রতি বাবা-মার স্নেহ, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রীতি, বাবা-মার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধার কথা। এগুলো সবই ভক্তি কিন্তু জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজনে রূপান্তরিত।

সবশেষে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দু-এক কথা। সদগুরু শিব সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী বলেন, 'হিন্দুধর্ম অদ্বিতীয়, কারণ এর ঈশ্বর ও মানুষ সম্পর্কিত ধারণা। একজন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মন বৌদ্ধিক মন ও অতি সংবেদনশীল মন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়। সেই কেন্দ্রীভূত একক মন বা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে কর্ম।' হিন্দুধর্ম মানবিকতার মতোই

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এই যাত্রা একমাত্র হিন্দুধর্মে সম্ভব। অন্য কোনো ধর্মে সমালোচনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ হিন্দুধর্ম নাস্তিকের সব নিন্দা সমালোচনা— এমনকী অপমানও মুখ বুজে সহ্য করার ক্ষমতা দেয়।

সীমাহীন। ধনী-নির্ধন, ভাববাদী বস্তুবাদী, জ্ঞানী মূর্খ— কেউই হিন্দুধর্মে অনাহূত নয়।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মের তুলনা অবান্তর। হিন্দুধর্ম অপৌরুষেয়, সনাতন। এর কোনো শুরু নেই। সুতরাং কোনো শেষও থাকবে না। যতদিন পৃথিবী থাকবে জীবের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ এই ধর্মও থাকবে। হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের নিজের সৃজন । কিন্তু খৃষ্ট বা ইসলাম মানুষের সৃজন। তাঁরা ঈশ্বরের বরপুত্র বা পয়গম্বর। কর্মও তাই।

হিন্দুধর্ম মানেই অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা সহৃদয়তা ও ধৈর্য। হিন্দুরা বিশ্বাস করে প্রতিটি আত্মাই কর্মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মা যখন এই শরীরকে অসার ও নিজেকে সারাৎসার হিসেবে চিনতে পারে তখনই তার মোক্ষলাভ হয়। তারপর শরীর ধারণ করতে হয় না। নচেৎ আত্মাকে বারবার এই পৃথিবীতে আসতে হয়। কর্ম তাকে নাস্তিক্য থেকে আস্তিক্যের পথে নিয়ে যায় এবং প্রতিটি আত্মাকে দস্যু রত্নাকর থেকে ঋষি বাল্মীকি করে তোলে।

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এই যাত্রা একমাত্র হিন্দুধর্মে সম্ভব। অন্য কোনো ধর্মে সমালোচনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ হিন্দুধর্ম নাস্তিকের সব নিন্দা সমালোচনা— এমনকী অপমানও মুখ বুজে সহ্য করার ক্ষমতা দেয়। ক্ষমা করে তার সব দীনতা। তারপর তার হাত ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে তাকে এগিয়ে দেয় আলোর দিকে। অবিশ্বাসীকে ক্ষমার থেকে বড়ো আলো আর কিছু নেই। সেই আলো হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুধর্ম জ্বালিয়ে রেখেছে— উত্তরণের পথ দেখাচ্ছে বহু মানুষকে, মজবুত করছে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি— তাই হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ। অদ্বিতীয়।

(তথ্যসূত্র : 'দি হিন্দু')

এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

রোগ নিরাময়ে যোগ

ধীরেন দেবনাথ

২১ জুন 'বিশ্ব যোগ দিবস'। এই দিনটি 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' নামেও সবিশেষ পরিচিত। যোগ এক ধরনের শরীরচর্চা। রোগ নিরাময়ক। ওষুধ সেবনে যেমন রোগীর রোগ নিরাময় হয় তেমনি যোগচর্চার মাধ্যমেও রোগী হন রোগমুক্ত। তবে ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলেও যোগে তা নেই। অর্থাৎ যোগ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন। বিশ্বের বিভিন্ন যোগাচার্য, যোগগুরু বা যোগ শিক্ষকের অদম্য প্রচেষ্টা এবং ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগ্রহ, উদ্যোগ ও সুপারিশে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সত্যতা যাচাইয়ের পর ২১ জুনকে 'বিশ্ব যোগ দিবস' রূপে ঘোষণা করেছে।

যোগ প্রাচীন ভারতীয় একটি বিদ্যা। একে অনেকে বলেন যোগব্যায়াম। দৈনন্দিন জীবনে যোগচর্চার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বশান্তি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও সুরক্ষায় ভারতীয় যোগের অবদান অনস্বীকার্য। যোগ শব্দটি সংস্কৃত যুজ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট। যার অর্থ যুক্ত করা। আবার ইংরেজি Yoke (That which joins together), প্রাচীন ইংরেজি Geoc, ল্যাটিন Jugum, গ্রীক Zygon প্রভৃতি শব্দের অর্থও 'To join' বা যুক্ত করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কার সঙ্গে কাকে যুক্ত করা?

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'সংযোগ যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মনো।' অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধনই হচ্ছে যোগ।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধ করাই যোগ।

মহাযোগী মহাদেব বলেছেন, 'যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরী।' (যোগবীজ) অর্থাৎ হে মহাদেবী, যোগহীন জ্ঞান মুক্তির কারণ হতে পারে না। যোগ সাধন দ্বারা সমাধিলব্ধ জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

আদিত্য পুরাণও বলছে, 'যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগোময্যেক চিত্ততা।' অর্থাৎ যোগের দ্বারা চিত্তের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারলেই জ্ঞানোদয় ঘটে।

কাজেই, সর্বোৎকৃষ্ট সাধনাই হচ্ছে যোগ। যোগ সব সাধনার মূল। কোনো ধর্মের কোনো সাধনাই যোগসংশ্রবশূন্য নয়। এক পরমাত্মাই একাধিক জীবাত্মারূপে বিরাজিত। তাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযুক্তিই জীবের চরম ও পরম গতি।

শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে, 'নাস্ত্যকৃত কৃতেন'। অর্থাৎ কর্ম দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। কর্ম হচ্ছে বন্ধনের কারণ। 'কর্মণা বধ্যতে জন্তুরিতিস্মৃতি...''। সুতরাং মুক্তির হেতু কর্ম নয়। যোগসাধনার দ্বারা আত্মদর্শনই উত্তম জ্ঞান। আর জ্ঞানই দেখায় মুক্তির পথ।

যোগীগণ বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা গুহ্যযোগ সাধনার মাধ্যমে শুদ্ধ জ্ঞানোন্মেষকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তো মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বলেছেন,—

''জয়্যাচারদমাহিংসা দানং স্বাধ্যায় কর্ম চ।

অয়স্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনা-ত্মদর্শনম্।।''

অর্থাৎ যাগযজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায়— এইসব কর্ম অপেক্ষা যোগ দ্বারা আত্মদর্শনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আদি বৈদিক যুগের একটি প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ হচ্ছে যোগ। দেবাদিদেব মহাদেব বা ঋগ্বেদে বর্ণিত রুদ্র যোগ সাধনার প্রবর্তক। তাই মহাদেব, রুদ্র বা মহেশ্বর যোগী বা যতি। 'যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ।' —সুত সংহিতা। এক শ্রেণীর ঋষি রুদ্রদেব বা মহেশ্বরকে প্রসন্ন করতে নানাবিধ আসন, যেমন— প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ ও ধ্যানের মাধ্যমে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে ইন্দ্রিয় সংযম করে রুদ্রদেবের উপাসনা করতে লাগলেন। এই উপাসনা পদ্ধতিগুলি 'যোগ' নামে হলো অভিহিত। আর সেই উপাসকরা যোগী নামে পরিচিত হলেন। তাঁরা রুদ্রদেবের আশীর্বাদ পেলেন, দর্শন পেলেন, শতায়ু হলেন— হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। অর্থাৎ তাঁরা হলেন ব্যধিমুক্ত বা নীরোগ, অজর ও অমর। তাছাড়া যোগ সাধনা দ্বারা তাঁরা শুধু জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকেই জয় করলেন না, পেলেন অমৃতের সন্ধান, যোগবিভূতি এবং হলেন অনন্ত দৈবশক্তির অধিকারী।

এখন দেখা যাক, শ্রীমদ্ভগবদগীতা কী বলছে। গীতায় যে আঠারো (অষ্টাদশ)-টি অধ্যায় রয়েছে তার প্রতিটির সঙ্গে যুক্ত আছে যোগ। যেমন— অর্জুন বিষাদ যোগঃ, সাংখ্য যোগঃ, কর্ম যোগঃ, জ্ঞান যোগঃ, কর্ম সন্ন্যাস যোগঃ, অভ্যাস যোগঃ, জ্ঞানবিজ্ঞান যোগঃ, অক্ষরব্রহ্ম যোগঃ, রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগঃ, বিভূতি যোগঃ, বিশ্বরূপদর্শন যোগঃ, ভক্তি যোগঃ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগঃ, গুণত্রয়বিভাগ

যোগঃ, পুরুষোত্তম যোগঃ, দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ যোগঃ, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগঃ ও মোক্ষ যোগঃ। গীতায় প্রিয়সখা অর্জুনের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

''শ্রুতিবিপ্রতিপন্নাতে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।'' (সাংখ্য যোগঃ ৫৩)

অর্থাৎ যখন তোমার শ্রুতিদ্বারা সংসিদ্ধ বুদ্ধি অচল হয়ে মন স্থিরভাবে অবস্থান করবে, তখনই তুমি যোগ লাভ করবে।

''স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।'' (জ্ঞান যোগঃ৩)

অর্থাৎ তুমি আমার ভক্ত ও সখা। সেহেতু তোমার সমীপে আজ আমি সেই প্রাচীন যোগ বললাম। যেহেতু ইহা উত্তম রহস্য।

''শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।''
(কর্ম-সন্ন্যাস যোগঃ ২৩)

অর্থাৎ দেহত্যাগের পূর্বে কাম-ক্রোধ থেকে সৃষ্ট বেগ যিনি সহ্য করতে সক্ষম, তিনিই যোগী (যুক্তঃ) ও সুখী।

''তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জগাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।''
(অভ্যাস যোগঃ ১২)

অর্থাৎ সেই যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে মনকে একাগ্র ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সংযত করে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগাভ্যাস করবেন।

তিনিই (শ্রীকৃষ্ণ) আবার অর্জুনকে যোগী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন,—

''তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।।''
(অভ্যাস যোগঃ ৪৬)

অর্থাৎ যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষাশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মানুষ্ঠানকারীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন তুমি যোগী হও।

যোগশাস্ত্রে বহু যোগের উল্লেখ আছে। যেমন— প্রকৃতি-পুরুষ যোগ, নাদবিন্দুযোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ, পতঞ্জলিযোগ ইত্যাদি। এছাড়াও 'মনঃ প্রশমনোপায়ঃ যোগঃ, 'সমঙ্কযোগঃ উচ্যতে' ইত্যাদিও শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মহর্ষি পতঞ্জলি উদ্ভাবিত যোগ পতঞ্জলি যোগ নামে খ্যাত। বর্তমান বিশ্বে এই যোগের প্রচলনই সর্বাধিক। দৈনন্দিন যোগচর্চার মাধ্যমে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যে সুস্থ, নীরোগ, দুশ্চিন্তামুক্ত, উন্নত এবং শান্তিপূর্ণ, সচ্ছল ও স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হতে পারে তা আজ প্রমাণিত সত্য। যোগ যে বহু জটিল রোগ উপশমে বা নিরাময়ে সক্ষম তাতে নেই কোনো সন্দেহের অবকাশ। আর সেই সুবাদে সারা বিশ্বে বিশেষত পাশ্চাত্যের অনেক দেশে যোগচর্চা চলছে জোর কদমে। এমনকী, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে যোগকে করা হয়েছে অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এ কাজে ভারতীয় যোগগুরুদের নিরলস প্রচেষ্টা, একাগ্রতা ও অবদান অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে শ্রীশ্রী রবিশঙ্করজীর 'আর্ট অব লিভিং' ও যোগগুরু রামদেবের 'পতঞ্জলি যোগ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আধুনিক শারীরবিদ্যায় যে 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' (A sound mind in a sound physique)-এর কথা বলা হয়েছে তা যোগশাস্ত্রেরই কথা। তাই ভারতীয় যোগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে ২০১৪-র ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের যৌথ অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগদিবস রূপে পালনের প্রস্তাব দিলে নেপাল তৎক্ষণাৎ তাকে সমর্থন করে। প্রস্তাবের পক্ষ অবলম্বন করে ১৭৫টি সদস্যরাষ্ট্রও। ১১ ডিসেম্বর ২০১৪, ভোটাভুটি ছাড়া সর্বসম্মতভাবে যোগদিবস পালনের প্রস্তাব অনুমোদন করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। ফলে প্রাচীন ভারতীয় যোগ পায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এটা ভারতের কাছে একটা বিরাট জয়।

তবে যোগ প্রচলিত কোনো ধর্ম নয়। ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কও নেই। যোগ শুধুমাত্র শরীর ও মনকে সবল ও সুস্থ রাখার একটি নিত্য প্রক্রিয়া বা কর্মপদ্ধতি। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় দীর্ঘদিন ঈশ্বর তথা আল্লাহ্‌র চিন্তায় ধ্যানস্থ ছিলেন। এই ধ্যানও এক ধরনের যোগ। আর এই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই তাঁর নবিত্ব বা নবুয়ত প্রাপ্তি ঘটে এবং তিনি শুনতে পান আল্লাহ্‌র বাণী বা ওহী। শোনা যায়, ধ্যানস্থ হওয়ার আগে তিনি ভারতে এসে এক যোগীর কাছে যোগশিক্ষা নেন। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অভিমত, খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখৃষ্ট যোগশিক্ষার জন্য ভারতে এসে যোগী চেতননাথের কাছে যোগশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর নাম হয় ঈশাইনাথ। (সূত্র : Jesus Secret : The Unknown life of Jesus– Dr. Robert Siblerud)। আর এসব কথা যদি সত্যি হয় তবে মহম্মদ ও যিশু উভয়ই ছিলেন যোগী। তাছাড়া বুদ্ধ, মহাবীর, গুরুনানক প্রমুখ ধ্যান বা যোগসাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাই মানুষ তাঁদের ঈশ্বর জ্ঞানে পুজো করেন। বিশ্বাস করেন।

তাই কোনো ধর্মই যোগবিরোধী নয়। তবুও একশ্রেণীর মানুষ যোগের বিরোধিতা করছেন এবং যোগকে ধর্মের আঙিনায় টেনে নামাচ্ছেন। আসলে এঁরা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে যোগকে দেখছেন। এঁরা যোগের উপযোগিতাকেই অস্বীকার করছেন।

বেদ বলছে,—

''সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।''

অর্থাৎ সবাই সুখী হোক, সবাই নীরোগ হোক। ▮

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা

অন্য রকম

বিস্ময়বালক তানিষ্ক আব্রাহাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে বয়সে বাচ্চারা ভিডিয়ো গেমস খেলে, টিভিতে আইপিএল-এর ম্যাচ দেখে কিংবা মেসি বড়ো না রোনাল্ডো বড়ো তাই নিয়ে তর্ক করে সময় কাটিয়ে দেয়, ঠিক সেই বয়েসে তার হাতে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই, চোখে চশমা, ঠোঁটে সলজ্জ হাসি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই ছেলে মাত্র আঠারো বছর বয়েসেই এমডি ডিগ্রি পকেটে পুরে ফেলবে।

ঘটনাটা ভারতীয় হিসেবে আমাদের সকলেরই গর্বের। কারণ আমেরিকার স্যাক্রামেন্টোর বাসিন্দা এই বিস্ময়বালক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নাম তানিষ্ক আব্রাহাম। মাত্র বারো বছর বয়েসেই সে তিন ধরনের কলেজ

থেকে ডিগ্রি নিয়ে বসে আছে। ডাক এসেছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি পৃথক ক্যাম্পাস থেকে। তানিষ্ক সাড়া দিয়েছে তাতেও। আপাতত চলছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনা। এই কোর্স শেষ করে তানিষ্ক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষক হয়ে উঠবে। আবিষ্কার করবে নতুন নতুন ওষুধ।

তানিষ্কের বায়োডেটা দেখলে যে কোনো লোকের মাথা ঘুরে যাবে। মাত্র সাত বছর বয়েসে কমিউনিটি কলেজে তার পড়াশোনা শুরু। বিষয় সাধারণ বিজ্ঞান। এই বিভাগে চারটি বিষয় পড়ানো হয়— সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত এবং বিদেশি ভাষা। পাঁচ বছর পর অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করে তানিষ্ক। তার প্রতিভার দ্যুতিতে চমকে ওঠে সারা বিশ্ব। যদিও তানিষ্ক জানিয়েছে শুধু তাকে নিয়েই এত উৎসাহিত হওয়ার মতো কিছু নেই। একই বয়েসি অনেকেই তার সহপাঠী ছিল কমিউনিটি কলেজে। সব থেকে বড়ো কথা তারা সকলেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

সাম্প্রতিক একটি টিভি সাক্ষাৎকারে তানিস্ক জানিয়েছে, প্রথম যখন সে কলেজে ভর্তি হতে গিয়েছিল বয়েস কম দেখে বেশিরভাগ অধ্যাপকই তাকে নিতে চাননি। তার মা নাম করা পশু চিকিৎসক— কতকটা তাঁরই অনুরোধে অধ্যাপকেরা রাজি হন। অবশ্য শুধু মায়ের অনুরোধ নয় তানিষ্ককে নেওয়ার পিছনে আরও একটা কারণ ছিল। ওই বয়সেই মায়ের মুখে শুনে শুনে সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং বিশেষ আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে তানিষ্কের বেশ স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠেছিল। ভর্তি হবার সময় সেটাই সে অধ্যাপকদের শুনিয়ে দিয়েছিল। দুধের বাচ্চার মুখে গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা শুনে সবাই কার্যত স্তম্ভিত হয়ে যান।

তানিষ্কের বাবা বিজয় আব্রাহাম পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মা তাজি পশু চিকিৎসক। দু'জনেরই জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কেরলে। বিশ্বজুড়ে ছেলের প্রশংসায় বাবা-মা দু'জনেই খুব খুশি। তাঁরাও স্বপ্ন দেখছেন তানিষ্ক বড়ো হয়ে মূল্যবান গবেষণা করবে। তানিষ্কের প্রথম কলেজ রিভার কলেজের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক মার্লিন মার্টিনেজও ছাত্রকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। বিস্ময়বালকের প্রতিভার গভীরতা ঠিক কতটা? মার্লিন জানালেন, 'ছোট থেকেই কোনো প্রশ্ন করতে ও পিছপা হোত না। এমনকী নিজের ব্যাখ্যাও তৈরি করে ফেলেছিল। শুনে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। যে-কোনো জটিল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা আছে ওর।'

সারা বিশ্ব এখন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এক যুগন্ধর প্রতিভার স্ফুরণ এবং বিকাশ দেখব আমরা। ভাবতে ভালো লাগবে তানিষ্কের জিনে মিশে রয়েছে ভারতীয়ত্ব। সেই দিক থেকে দেখলে তানিস্ক প্রথমে ভারতের তারপর বিশ্বের। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

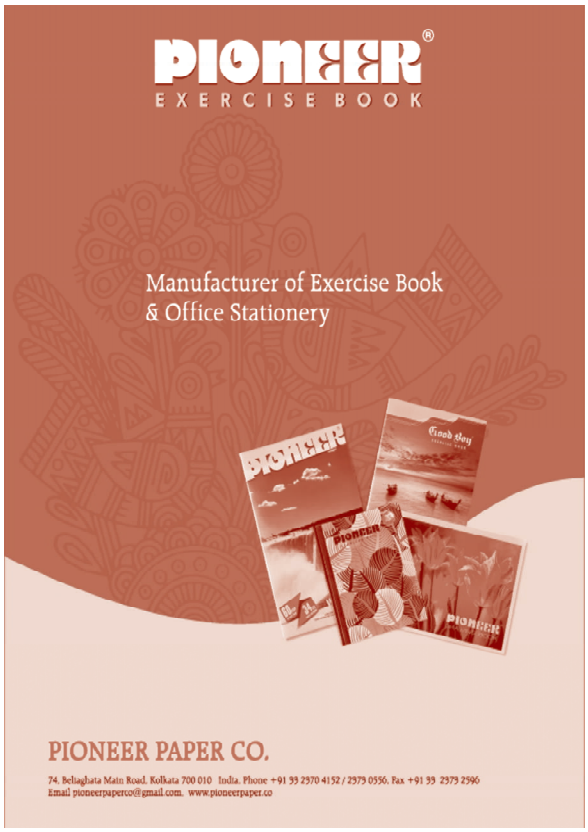

‘এতেই বোঝা যায়, ভারতে ধর্মের সম্পূর্ণ তাৎপর্য আধ্যাত্মিকতায়। ধর্মকে কখনও আধ্যাত্মিকতার পরিপূরণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। স্বয়ংপ্রকাশ আধ্যাত্মিকতা নিজেকে নানাভাবে অভিব্যক্ত করে এবং ধর্মপ্রচার সেই অভিব্যক্তির অন্যতম। আচার্য রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ— এঁদের প্রত্যেকের অবলম্বিত প্রকাশভঙ্গি কত বিভিন্ন। কিন্তু এ বিষয়ে কি তর্কের অবকাশ আছে যে একই আধ্যাত্মিক ভাববন্যা বিভিন্ন ধর্মের পশ্চাতে রয়েছে?’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সাহিত্যে উপেক্ষিতাদের বিস্মৃতির গহ্বর থেকে তুলে আনাই প্রকৃত গবেষকের কাজ

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন বাঙালিরা বড় আত্মবিস্মৃত জাতি। পদে পদে আমরা তাঁর উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করি। বাঙালির ইতিহাস মণিমুক্তাময়। অথচ আমরা এই ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিবহাল নই। মাত্র ৫০০ বছর আগে চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৫-১৫৩৩) নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়ে অসম মণিপুর বাংলা

ওড়িশা জুড়ে এক বিশাল এলাকায় মহাবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তার কতটুকু আমরা জানি, কতটুকু বা আলোচনা করি? দুঃখের কথা, শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে আলোচনা করেন প্রধানত বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা। তাঁরাই যেন শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘিরে বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন বাঁচিয়ে রেখেছেন। মজার কথা, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন জার্মানির মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬)। তিনিও শ্রীচৈতন্যের মতো মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব এনেছিলেন। অথচ তাঁকে নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণার শেষ নেই। তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীর পাতা উল্টালেই দেখা যাবে বছরে বছরে ইউরোপের নানা ভাষায় তাঁকে নিয়ে কত প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, কত সেমিনার। কিন্তু শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে দু'-তিন বছরে একটি-দু'টি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় কিনা সন্দেহ। মোট কথা, তাঁকে নিয়ে আলোচনার ধারা প্রায় শুষ্ক। তবুও মন্দের ভালো তাঁকে নিয়ে যাঁরা অনলস চর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে সমীর চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর চৈতন্য সাহিত্য নিয়ে গবেষণাগ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্য স্মৃতিকথা, স্মরণে মননে চৈতন্যদেব, ক্যুইজ অন শ্রীচৈতন্যদেব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ ক্যুইজ অন শ্রীচৈতন্য জায়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। গ্রন্থটির নামেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু প্রকট। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের সমস্ত ঘটনাকে নিয়ে ক্যুইজ। ইদানীং ক্যুইজের খুব প্রচলন হয়েছে। ক্যুইজের মধ্য দিয়ে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যায়। কোনো বিষয় নিয়ে একাধিক বই পড়লেও অনেক তথ্য মনে থাকে না, ক্যুইজ সে অভাব পূরণ করে। আলোচ্য গ্রন্থটির উদ্দেশ্যও তাই। শ্রীচৈতন্য জায়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্থটিতে ৪৩৭টি ক্যুইজ আছে, যা মনোযোগ-সহ পড়লে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে তো বটেই শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর পার্ষদদের সম্বন্ধে সবিশদ জানা যাবে। সেই হিসেবে এই গ্রন্থটি অভিনব।

গ্রন্থটিতে শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়ের গবেষক মনের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক লক্ষ্য করেছেন শ্রীচৈতন্য জায়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে কোনো অজ্ঞাত কারণে বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা মোটেই আলোচনা করেন না। লেখক তাই তাঁকে নিয়ে আলোচনায় নেমেছেন। এটিই সত্যিকার গবেষকের লক্ষণ। সাহিত্যে উপেক্ষিতাদের বিস্মৃতির গহ্বর থেকে তুলে আনাই প্রকৃত গবেষকের কাজ। লেখক সেই কাজটিই করেছেন। সেই হিসেবে তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

একটি কথা না বললে নয়। গ্রন্থে লেখক প্রায়শই গুরুচণ্ডালি ভাষা ব্যবহার করেছেন। ফলে গ্রন্থটির সৌকর্য নষ্ট হয়েছে। গবেষণাগ্রন্থে এমন ত্রুটি বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি পরের সংস্করণে লেখক এই ত্রুটি দূর করতে উদ্যোগী হবেন। যাই হোক, আমরা এই আকর গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ক্যুইজ অন শ্রীচৈতন্য জায়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। লেখক---সমীর চট্টোপাধ্যায়। তটভূমি প্রকাশনী, কালনা, বর্ধমান। মূল্য : ৫০ টাকা।

মঙ্গলনিধি

গত ১২ জুন কলকাতা পূর্ব বিভাগের মাধবনগরের কার্যবাহ রামকৃষ্ণ পাল তাঁর কন্যার শুভবিবাহ উপলক্ষে প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা আমন্ত্রিত ছিলেন।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সাধারণ সভা

গত ১৯ জুন দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার মানিকতলাস্থিত কল্যাণভবনে। সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্রাম জামদার, অখিল ভারতীয় সহ নাটক সংযোজক বিকাশ ভট্টাচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশের সভাপতি তপন গাঙ্গুলি, প্রদেশের উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য, প্রদেশের সহ-সভাপতি গুরুপদ প্রামাণিক, প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় এবং প্রদেশের সংরক্ষক কেশররাও দীক্ষিত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রদেশ কার্যকারিণীর সদস্য শক্তিশেখর দাস পুরো সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গ

দক্ষিণবঙ্গে ধর্মজাগরণের কাজে গতি আনার জন্য, অখিল ভারতীয় প্রমুখ রাজেন্দ্র প্রসাদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংস্কৃতি প্রমুখ আত্মপ্রকাশানন্দ মহারাজ ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহার উপস্থিতিতে গত ১৮-১৯ জুন প্রদেশ কার্যকর্তাদের অভ্যাসবর্গ ও এক সন্ত চিন্তন বৈঠকের আয়োজন করা হয় জেলার ডুমুরদহ স্টেশন সংলগ্ন পুণ্যভূমি শ্রীশ্রী উত্তমানন্দ মহারাজের উত্তম আশ্রমে। বৈঠকে শতাধিক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ অফ বেঙ্গলের প্রচারাভিযান

গত ১৫ জুন 'বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতনতা দিবস' উপলক্ষে প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ রাজ্যের নয়া প্রশাসনিক ভবন নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংসের সামনে এক জমায়েতের মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ ও তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে। এক দল প্রবীণ বিবাদীবাগের ব্যস্ততম আদালত চত্বরে এভাবে প্রচার অভিযানে নামায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য দেখা যায়। বহু মানুষ আজকের নিরাপত্তাহীন অসহায় পিতামাতার একাকী জীবনযাপন নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে ওঠায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। আইনজীবীরাও এগিয়ে এসে তাদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরার অনুরোধ করেন। পুলিশও এগিয়ে এসে প্রচারপত্র নেয় এবং সমস্তরকম সহযোগিতা করে। সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে'র নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী রাজ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মলয় ঘটকের হাতে স্মারকলিপির মাধ্যমে রাজ্যে অবিলম্বে মেন্টেন্যান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট, ২০০৭ আইনটি পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করার দাবি জানান। রাজ্যপাল বাইরে থাকায় প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি সরাসরি পাঠানো হয়।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দশম বাঁকুড়া শিশুমন্দিরের ছাত্র

২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে বাঁকুড়া নগরের কেন্দুয়াডিহি প্রণবানন্দ পল্লীতে অবস্থিত বিষ্ণুপদ সরস্বতী শিশু মন্দিরের

প্রাক্তন ভাই সৌম্যকান্তি মণ্ডল। বিষ্ণুপদ সরস্বতী শিশু মন্দিরে ২০০৩ সালে ভর্তি হওয়া সেই ছোট সৌম্যকান্তি অঙ্কুর শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের পর কিশলয় শ্রেণীতে, তারপর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনো করে বাঁকুড়া জেলাস্কুলে ভর্তি হয়। বাবা হাইস্কুলের শিক্ষক দিলীপ মণ্ডল। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন যে সৌমর ভিত খুব ভালোভাবে তৈরি হয়েছে শিশু মন্দিরের আচার্য আচার্যার সাহচর্যে।

গো-হত্যার অর্থ মাতৃহত্যা

কমল মুখোপাধ্যায়

খবরে প্রকাশ মমতা ব্যানার্জী ট্যাংরাতে একটি কষাইখানার উদ্বোধন করবেন যেখানে প্রতিদিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ১২৫০টি গোরু জবাই করা হবে। এই ভারতবর্ষে এইরকম আর কত গোরু কাটার মেশিন আছে জানি না, তবে খবরটার ভয়াবহতা উল্লেখ না করে পারলাম না।

অনেকেই বলবেন যার যা খাদ্য খাবে এই নিয়ে হৈ চৈ করার কোনো কারণ নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল কলকাতায় বিকাশ ভট্টাচার্য, কবি সুবোধ গো-মাংস খেয়ে সেকুলার হিসেবে নিজেদের জাহির করেছেন। প্রকাশ্যে গোহত্যা হিন্দুদের বিবেকে বাঁধে, অস্বস্তি লাগে। ইসলামে নিষিদ্ধ শুয়োরের মাংস তো খেতে দেখলে বুঝতাম প্রকৃত সেকুলার।

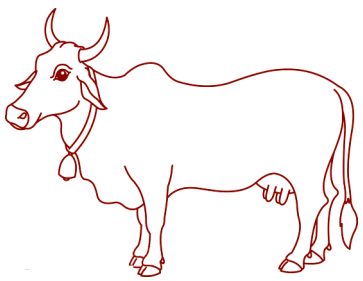

প্রকাশ্যে গোরু কাটা বা গোমাংস খাওয়া আমাদের দেশে আইন বিরুদ্ধ। অনেক রাজ্যে গোমাংস খাওয়া বা গোহত্যা নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ অতি আধুনিক, অতি উদার, তাই এখানে ওসব আইন নেই। এখন গোহত্যা বন্ধের জন্য এত শোরগোল কেন সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

আমাদের দেশে বা পৃথিবীর সর্বত্র শিশু জন্মালে মাতৃদুগ্ধ পান করে। মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। মাতৃদুগ্ধ দু'বছর খেলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায়, মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আজকাল নানারকমের বেবি ফুড পাওয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত এসব খেলে শিশুর শরীরের ক্ষতি হয়।

আপনার বাড়িতে অতিথি এসেছে। পুরনো দিন হলে গুড়, বাতাসা, চিড়ে, মুড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। এখন সেটা অতীত। এখন এক কাপ চা, একটা দুটো বিস্কুট বা চানাচুর ইত্যাদি। চা করতে গেলে দুধ লাগে। অবশ্য এখন অনেক বাড়িতে লাল চা বা গ্রিন টি প্রচলন হয়েছে। তবে শতকরা হিসাবে দুধ-চায়ের প্রচলন বেশি। পূজা পার্বণে দুধ, দই-মিষ্টি সন্দেশ লাগে সেটা দুধ থেকেই আসে। কোনো অনুষ্ঠানে বা ভোজবাড়িতে মিষ্টি, দই, আইসক্রিম অপরিহার্য। গোময়, গোমূত্র পূজাপার্বণে লাগে। এখনো বহু বাড়িতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে গোবর দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়। গোময়-গোমূত্র জীবাণু ধ্বংসকারী, শুধু কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলে হবে না। চাষবাসে আজকাল কৃত্রিম বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কেননা তার ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, ফসল উৎপাদন কমছে, মাটি বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। সরকার থেকে জৈব সার ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট থেকে জ্বালানি বা বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। এখনো গ্রামের বহু বাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ঘুঁটে ব্যবহার করা হয়। কয়লার চুল্লী ব্যবহারে যদিও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া গ্রামে গোবরসার সব ফসলের আগে ছড়ানো হয় যার ফলে ফসলের ক্ষতিকারক অনেক পোকা দমন করতে সাহায্য করে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় গো পালন এখন উঠেই যাচ্ছে। আগে প্রত্যেক ঘরে গোয়ালঘর থাকাটা অপরিহার্য ছিল। বলদগোরু, গাইবাছুর সকলের বাড়িতে থাকত। একজন রাখাল বা মাইন্দর থাকত। এখন সেসব অতীত। চাষবাসে ট্রাক্টর, পাওয়ারট্রিলার বলদ গোরুর স্থান দখল করেছে। তবু জোয়াল কাঁধে জোড়াবলদ চাষের জুড়ি নেই। গোরু থাকার ফলে প্রচুর গোবর পাওয়া যেত যা চাষের কাজে লাগানো হোত। গোয়ালভরা গোরু গোলাভরা ধান এখন রূপকথার গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচুর গোরু পালনের ফলে গোরু মরলে ভাগাড়ে রাখা হোত। মুচিরা সেই চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যেত জুতা বা অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরির জন্য। সুতরাং জুতা তৈরিতে কোনো সঙ্কট হওয়ার কথা নয়। মরা গোরুর হাড় থেকে সার তৈরিতে কোনো বাধা নেই। তাই অতীতকাল থেকে গোরুকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হোত। হিন্দুধর্মে যাঁর থেকে উপকার পাওয়া যায় তাকে শ্রদ্ধার আসনে রেখে পূজা করা হয়।

একটা গোরু সারাজীবন আমাদের জানপ্রাণ দিয়ে সেবা করে। বুড়ো বয়সে লালনপালন না করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মাংস খাওয়াটা মাতৃপিতৃ হত্যার সামিল। যে মা তিল তিল করে রক্তমাংস, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষ করল বুড়ো হলে সেই মাকে কেটে খেয়ে নেব বা দূর করে দেব বা দেখাশোনা করব না এর থেকে আর ঘোরতর পাপ আর কী হতে পারে। আজকে যদি চক্রবৃদ্ধি হারে গোরু নিধন হয়, দুধেল গোরু বা বাছুর নিধন হলে দুধের হাহাকার পড়ে যাবে। বহু শিশু বা বৃদ্ধ খেতে পাবে না, রোগাক্রান্ত হবে। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা বিঘ্নিত হবে। মিষ্টির দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, বহু লোক জীবিকা হারাবে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুলাংশে ভেঙে পড়বে। তাই সরকার যদি গোহত্যা বন্ধ করতে বলে তাহলে সেটা কী খুব অন্যায় হবে। সেকুলারপন্থীরা, উদারপন্থীরা, বিশেষ করে মুসলমানরা একটু ভেবে দেখুন। তাছাড়া আমাদের গরমের দেশে মাংস খাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত নয়। সারা বিশ্বে এখন নিরামিষাশীদের সংখ্যাই বেড়েই চলেছে।■

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

বিকাশ ভট্টাচার্য

কাবুলিওয়ালা ছায়াছবির একটি দৃশ্য।

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রকাহিনি

'সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্র' প্রথম বাংলাছবি। নির্বাক। প্রদর্শন ২৪.৩.১৯১৭ 'নিউ টেন্ট' ময়দানে। এরও ৬ বছর পরে 'মানভঞ্জন' গল্প নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র কাহিনির প্রথম আত্মপ্রকাশ। মুক্তিলাভ ১৮.৬.১৯২৩ কর্নওয়ালিস। পরিচালনা নরেশ মিত্র। অভিনয়ে ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এরপর ৭ রিলের সাদাকালো নির্বাক ছবি 'বিসর্জন'। মুক্তি ২৩.১২.১৯২৮ ক্রাউন সিনেমায়। প্রতিদিন ৩টা, ৬টা, ৯টা তিনটি করে শো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাসের চিত্ররূপ নিজে রচনা করেন। এরপর 'বিচারক', 'গিরিবালা', 'দালিয়া' প্রভৃতি আরও কিছু নির্বাক ছবির পর রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সাদাকালো সবাক ছবি 'দেনাপাওনা'। চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ৩০.১.১৯৩১-এ। পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ক্যামেরায় নীতীন বসু ও সঙ্গীত পরিচালনায় রাইচাঁদ বড়াল। সঙ্গীতে ছিলেন উমাশশী। তিনি অভিনয়ও করেছিলেন।

একবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে 'নটীর পূজা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা তথা উপালির ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অংশগ্রহণে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। নিউ থিয়েটার্স সেই অভিনয়ের সবাক ছবি তুলেছিল। ২২.৩.১৯৩২ চিত্রায় সেই ছবি মুক্তি পায়। অন্যমতে কবিগুরুর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতেই এটি গৃহীত হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র মাধ্যম একেবারে ভিন্নধর্মী তাই এ যেন 'নটীর পূজা' মঞ্চাভিনয়ের ডকুমেন্টারি। ক্যামেরা স্থির। ছবিটি জড়তা কাটাতে পারেনি।

এরপর পরপর 'চিরকুমার সভা' (চিত্রা ২৮.৫.৩২), 'নৌকাডুবি' (কর্নওয়ালিশ ৪.৬.৩২), 'চোখের বালি' (শ্রী ৩০.৭.৩৮), 'গোরা' (চিত্রা ৩০.৭.৩৮), 'শোধবোধ' (চিত্রা ২৮.৩.৪২), 'অভিসার' (১৯৪৪), 'নৌকাডুবি-২' (১৯.৯.৪৭ মিনার, বিজলি, ছবিঘর), 'দৃষ্টিদান' (চিত্রা ২৪.৪.৪৮), মালঞ্চ (২০.২.৫৩ ইন্দিরা, চিত্রা, প্রাচী), 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ৯.১০.৫৩), 'শেষের কবিতা' (লাইট হাউস, ইন্দিরা, চিত্রা ৪.১২.৫৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (মেট্রো, উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা)।

এ সমস্ত ছবির মধ্যে 'অভিসার' ছবিটি পরিচালনা করেন সেই সময়ের বিশিষ্ট অভিনেত্রী সাধনা বসু। মনে হয় সেই প্রথম বাংলা ছবি পরিচালনায় এলেন কোনো মহিলা। পরে অবশ্য কবিগুরুর গল্প নিয়ে ছবি পরিচালনা করেন অরুন্ধতী দেবী। ছবির নাম 'মেঘ ও রৌদ্র' (মিনার, বিজলী, ছবিঘর ১৩.৩.৭০), রবীন্দ্র কাহিনিতে উত্তমকুমার অভিনয় করেন 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' (১৯৫৩), চিরকুমার সভা (১৯৫৬), 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'নিশীথে' ছায়াছবিতে। অগ্রদূত প্রযোজিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গে উত্তমকুমার তাঁর 'আমার আমি' বইতে লিখেছেন '...রাইচরণ প্রধান চরিত্র। আমি কিন্তু সেদিন রাইচরণের ভূমিকায় অভিনয় করে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হইনি। আনন্দও পাইনি।' অবশ্য এ ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় প্রসঙ্গে সমালোচকরা বলেছেন, 'রবীন্দ্রসৃষ্ট রাইচরণের চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাব এবং মর্মবেদনা উত্তমকুমারের সুনিপুণ অভিনয়ে যথাযথভাবে ফুটে উঠেছিল।'

রবীন্দ্রকাহিনির প্রথম সার্থক ও সফল ছায়াছবি 'কাবুলিওয়ালা' (৪.১.৫৭)। তপন সিংহের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় এ ছবি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার (১৯৫৭) এবং বার্লিন ফিল্মোৎসবে সিলভার বিয়ার (১৯৫৭) অর্জন করে। কাবুলিওয়ালার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ও কেউ ভুলতে পারবে না। তপন সিংহের পরিচালনায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৯৬০) ছবিটিও রাষ্ট্রপতির শংসাপত্র পায়। এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায়। এঁর 'অতিথি'ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে কবির তিনটি গল্প পোষ্টমাস্টার, মণিহারা ও সমাপ্তি নিয়ে সত্যজিৎ রায় করেছিলেন 'তিন কন্যা'। সেই সময়ের জনপ্রিয় ছবি। দেশে বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত। এরপর সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের গল্প নষ্টনীড় নিয়ে 'চারুলতা' এবং উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' করেন। এর মধ্যে সৌমিত্র, মাধবী ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'চারুলতা' সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে দেবকীকুমার বসু কবিগুরুর চারটি কবিতা 'পূজারিণী', 'দুই বিঘা জমি', 'অভিসার' ও 'পুরাতন ভৃত্য' নিয়ে 'অর্ঘ্য' নামে ছবি করেন। ছবিটি প্রযোজনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কবিগুরুর উপন্যাস, গল্প, কবিতা এমনকী নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে বহুবার। সবকটির উল্লেখ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি'র উল্লেখ করতে হয়। পরিচালকের অন্যান্য ছবির তুলনায় এই দুটি ছবি সমালোচকদের চোখে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কবির সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত উপন্যাস 'চার অধ্যায়' নীতীশ রায় এবং 'এলার চার অধ্যায়' নাম দিয়ে বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি করেন। এ দুটিও দর্শকদের মনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি। প্রখ্যাত পরিচালক অজয় কর রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে 'মাল্যদান' করেন এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার অর্জন করেন। ৪.৫.১৯৭৩-এ মুক্তি পায় 'স্ত্রীর পত্র'। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় পূর্ণেন্দু পত্রী। ছবিটি জাতীয় পুরস্কার পায়। এই ছবি নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন শিল্পী, কবি ও বুদ্ধিজীবীরা। ■

শব্দরূপ-৭৯৩ শামাপ্রসাদ দাশ

■	■	১		২			৩
৪			■		■	■	
	■		■	৫	৬		■
৭			■	■		■	৮
	■		■	■	৯		
■	১০		১১	■		■	
১২	■	■		■	১৩		
১৪						■	■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. '— জ্বলে দূরের 'তারার পানে চেয়ে', **৪.** চীনা মতে পৃথিবীর আদি মানব, **৫.** কষ্টিপাথর, **৭.** শীতের সব্জি, **৯.** শুভদায়িনী, **১০.** বর্ণমালার লেখ্য সঙ্কেত, **১৩.** '— বাঁশিতে কে ডাকে', **১৪.** খল কপট।

উপর-নীচ : ১. ছুঁচ ফুটিয়ে রোগ সারানোর চৈনিক পদ্ধতি, **২.** দুর্যোধনের মাতুল, **৩.** রন্ধনের যোগ্য, **৪.** পুঙ্খানুপুঙ্খ, **৬.** পুরুলিয়া জেলার ধানচাষের পরবর্তী উৎসব, **৮.** তুচ্ছতাচ্ছিল্য, **১১.** অপরের ধন, **১২.** লীলা মজুমদারের কিশোর উপন্যাস, তাঁতের যন্ত্র।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯০
সঠিক উত্তরদাতা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

বা	■	■	বা	ল	খি	ল্য	■
তা	■	■	ম	■	টি	■	■
বি	ব	স্বা	ন	■	মি	■	■
■	টু	■	■	জ	টি	লা	■
■	ক	থ	ক	■	■	ল	■
■	■	ত	■	মা	ই	ন	র
■	■	ম	■	ত	■	■	ক্তা
■	প	ত	ঞ্জ	লি	■	■	ঙ্গ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৯৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ জুলাই ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

ভারতীয় জনসঙ্ঘ যে রাষ্ট্রীয় ও একাত্ম সংস্কৃতিকে স্বীকার করছে, 'অখণ্ড ভারত' শব্দের মধ্যেই তা অন্তর্নিহিত রয়েছে। অটক থেকে কটক, কচ্ছ থেকে কামরূপ, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভূমির প্রতিটি কণা পুণ্য ও পবিত্রই শুধু নয়, তাকে নিজের বলে মনে করার ভাবনা অখণ্ড ভারতেরই ভাবনা। এই পুণ্যভূমিতে অনাদিকাল থেকে যতই বিবিধতা থাকুক না কেন, ভারতের প্রত্যেক পূজারি তাতে অখণ্ড ভারতের একাত্মতাকেই দর্শন করেন।

সম্পূর্ণ জীবনের একতার অনুভূতি এবং সেই উপলব্ধির পথে আগত বাধা বিপত্তি দূর করার গঠনমূলক প্রয়াসের নামই ইতিহাস। পরাধীনতা আমাদের একাত্ম উপলব্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। সেজন্য আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। স্বাধীনতা লাভ একাত্ম উপলব্ধির সহায়ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত। এখন আমাদের জীবনে নানারূপ বিরোধীভাবের সঙ্ঘর্ষ চলছে। আমাদের রাষ্ট্রের প্রকৃতি হলো 'অখণ্ড ভারত'। খণ্ডিত ভারত হলো বিকৃতি। বিকৃতির মধ্যে আমরা আনন্দানুভূতি খুঁজে চলেছি। তাতে আশাহত হচ্ছি। যদি আমরা সত্যকে স্বীকার করি তাহলে আমাদের মনের সঙ্ঘর্ষ দূর হবে এবং আমাদের সমবেত চেষ্টায় একতা ও শক্তি উৎপন্ন হবে।

অখণ্ড ভারতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অ-রাষ্ট্রীয় মনোভাব। পাকিস্তান সৃষ্টি সেই মনোবৃত্তি থেকেই হয়েছে। হিন্দুদের সঙ্গে তারা থাকতে পারবে না— যদি তাদের এই ধারণা সত্য হয় তাহলে ভারতে ৬ কোটি মুসলমান থেকে যাওয়া রাষ্ট্রহিতের পক্ষে বিপদ নয় কী? কোনো কংগ্রেসী কি বলবেন যে, মুসলমানদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে? যদি না হয় তাহলে তাদের ভারতীয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হবে। একাত্মতার অভাবে দেশ খণ্ডিত হয়েছে। সেই একাত্মতার ভাবেই দেশ অখণ্ড হবে। আমরা তার জন্যই প্রয়াস করছি।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। বিক্রমাদিত্য।। ২৬

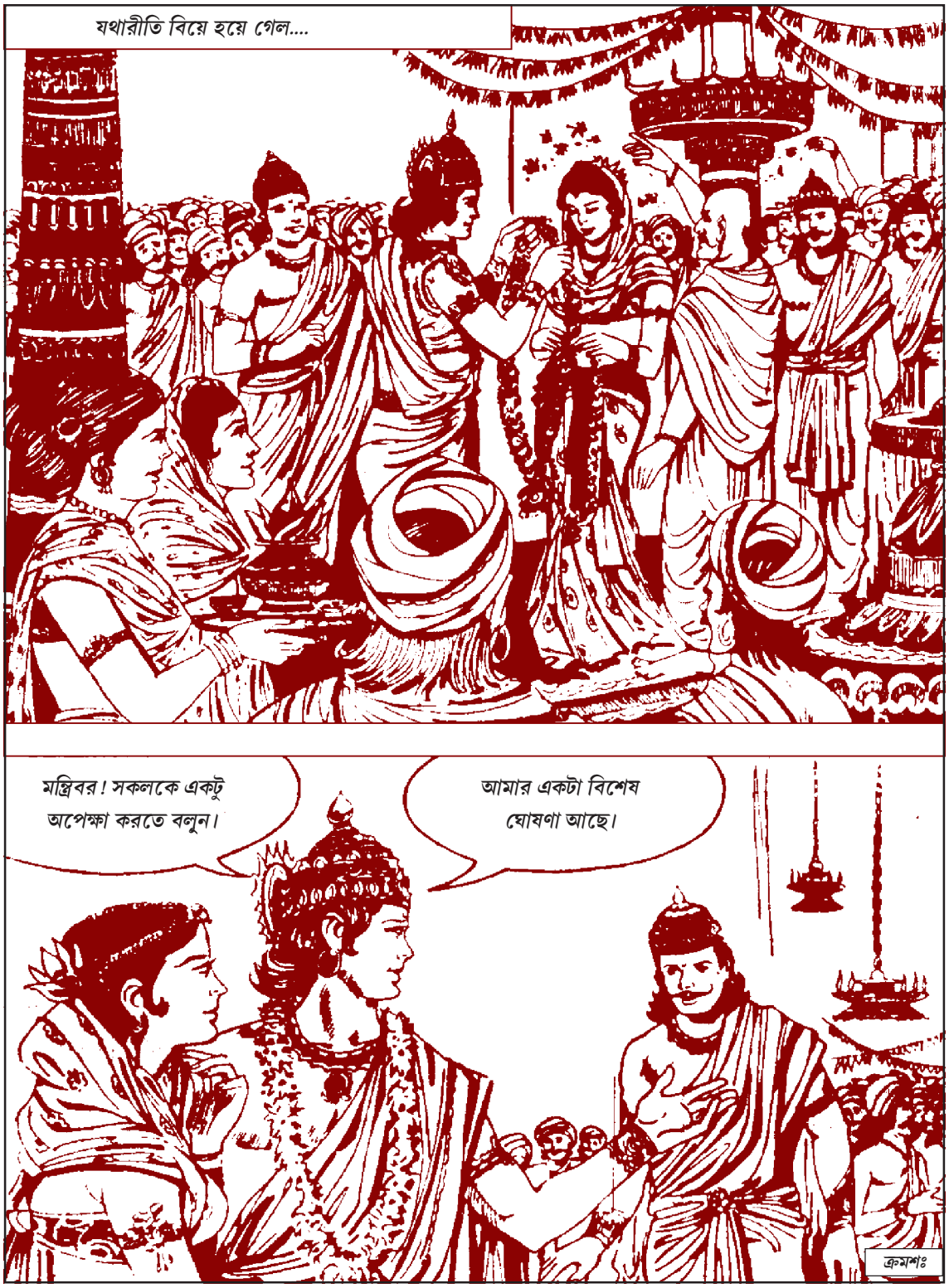

ভারতের কাছে বিশ্বকে সহিষ্ণুতা শিখতে হবে : দলাই লামা

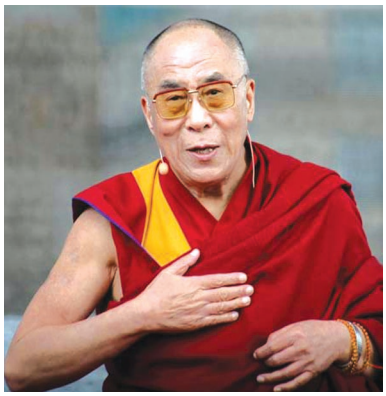

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের কাছে বিশ্বকে ধর্মীয় সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা শিখতে হবে। ভারতীয়রা দু' হাজার বছর ধরে তাদের ধর্মীয় সদ্ভাবনাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের উচিত ভারতকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করা। সম্প্রতি আমেরিকার নাইট ক্লাব হত্যাকাণ্ডে নিহতদের প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় এমনই মন্তব্য করলেন ধর্মগুরু দলাই লামা। 'ইউ এস ইনস্টিটিউট অব পিস' আয়োজিত এই সভায় তিনি বলেন— বহু সমস্যা সত্ত্বেও ভারত যদি এই সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারে তাহলে বাকি বিশ্ব তা পারবে না কেন? বিশ্বজুড়ে ঘটে চলা ইসলামি সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গে তাঁর মত— সত্যিই কেউ যদি ইসলামে বিশ্বাসী হয় তাহলে সে কখনো মানুষকে কোতল করতে পারে না। সভায় তিনি বার বার ভারতের প্রসঙ্গ টেনে বলেন— সবাইকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পাঠ ভারতের কাছ থেকেই নিতে হবে, কারণ ভারতেই একমাত্র সব ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারেন।

উপকূল রক্ষায় বিশেষ রক্ষীবাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশের ৭৫১৬ কিলোমিটার উপকূলবর্তী অঞ্চলের সুরক্ষায় বিশেষ রক্ষীবাহিনী গঠনের প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। বাহিনীর গঠনতন্ত্র এবং কাজের ধারা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা মন্ত্রক খুব শীঘ্র প্রকাশ করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বৈঠকে রাজনাথ সিং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যারা বেড়াতে যান তাঁদের নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব দেন। জানা গেছে, ওই বৈঠকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে উপকূল নিরাপত্তায় নজরদারি বৃদ্ধি, ছোট বন্দর এবং ভারতের ১৩২৮টি দ্বীপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র বিতরণ ইত্যাদি।

আই এস-কে রুখতে অ্যান্টি টেররিস্ট ইয়ুথ ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥

ভারতে আই এস আই এস-এর মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে রুখতে 'অ্যান্টি টেররিস্ট ইয়ুথ ফোরাম' খুলতে চলেছে রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ। যারা এই সংগঠনগুলি সম্পর্কে যুবকদের সচেতন ও তাদের গতিবিধি নজরে রাখবে। রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের পক্ষ থেকে ইন্দ্রেশ কুমার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানিয়েছেন।

কিছুদিন আগে ভারতীয় যুবকদের আই এস-এর মতো জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ইন্দ্রেশকুমার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন— আই এস আই এস ও আই এস আই-এর মতো সংগঠনগুলি জেহাদি তৈরির লক্ষ্যে যুবকদের ভুল পথে পরিচালিত করছে। ভারতেও তারা তাদের জাল বিস্তার করছে। যুবকদের তাদের হাত থেকে বাঁচাতে কাজ করবে এই ফোরাম। রমজান মাসের আগেই এই ফোরামের কাজ শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্থানীয় ভাবে রোজা ইফতার পার্টির আয়োজন এবং সদ্ভাব স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

কর্ণাটকে সঙ্ঘের হকি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি কর্ণাটকের কোদাগু জেলায় আম্মাত্তি হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ পরিচালিত হকি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল

কান্দ্রাটাণ্ডা সুব্বাইয়া। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কর্ণাটকের শারীরিক প্রমুখ চন্দ্রশেখর জাগিরদার।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
27 June - 2016 - Rs. 10.00

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

S.B.